“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

শিল্পী—বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প-ভারতী

ষোড়শ বর্ষ ॥ নবম সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৩৬৭

বিশেষ আকর্ষণ—একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস : রবীন্দ্র যুগ : বাংলার চিত্রশিল্প (সচিত্র সংযোজন)

ভারতের গৌরব
ভারতের শাশ্বত প্রাণধর্ম্ম ও
সংস্কৃতি অন্তর্নিহিত আছে
তার শিল্পে, ভাস্কর্যে···
যা আজও বিশ্বের কোটি
কোটি নরনারীর মনে শ্রদ্ধা
ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে।
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪
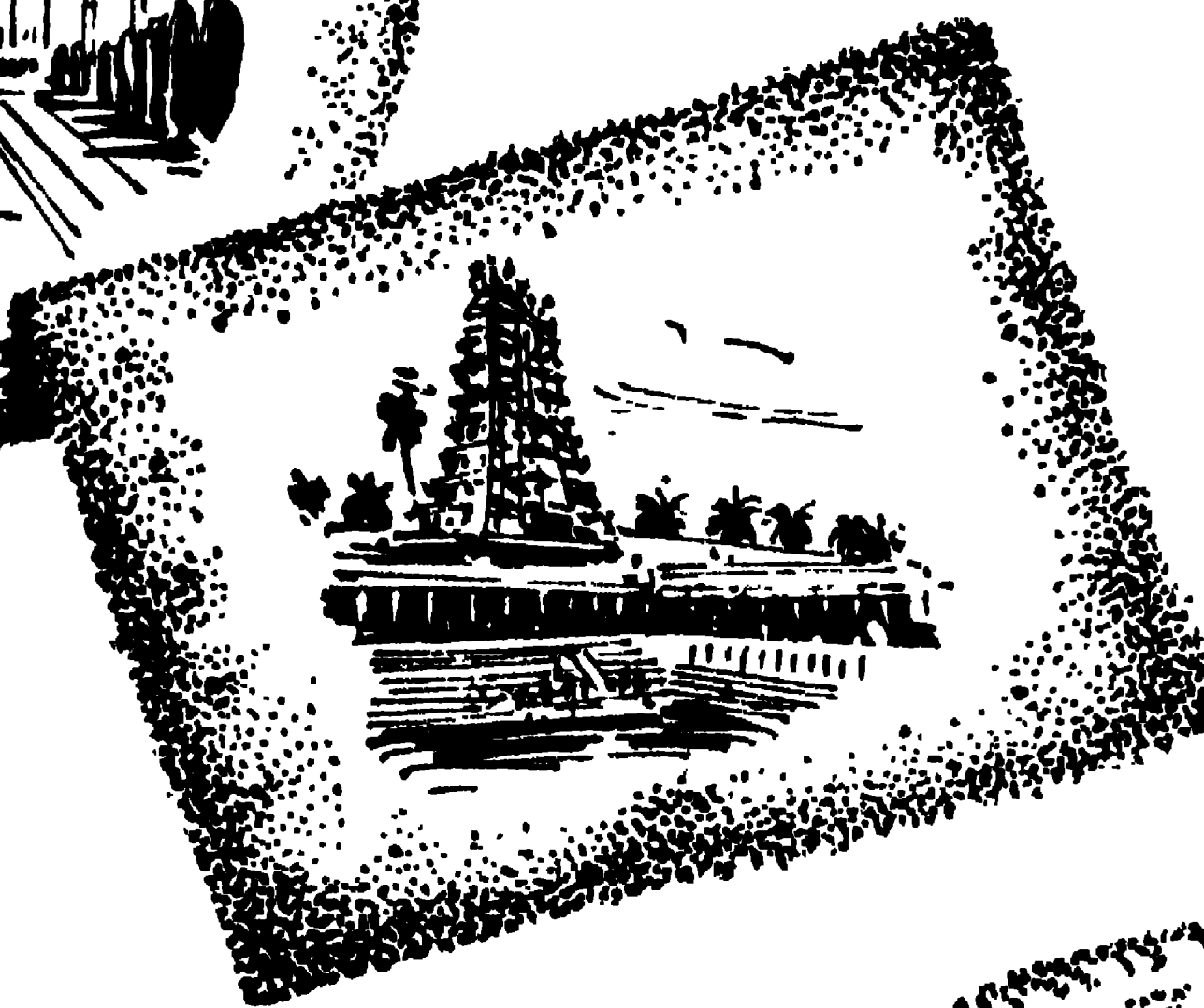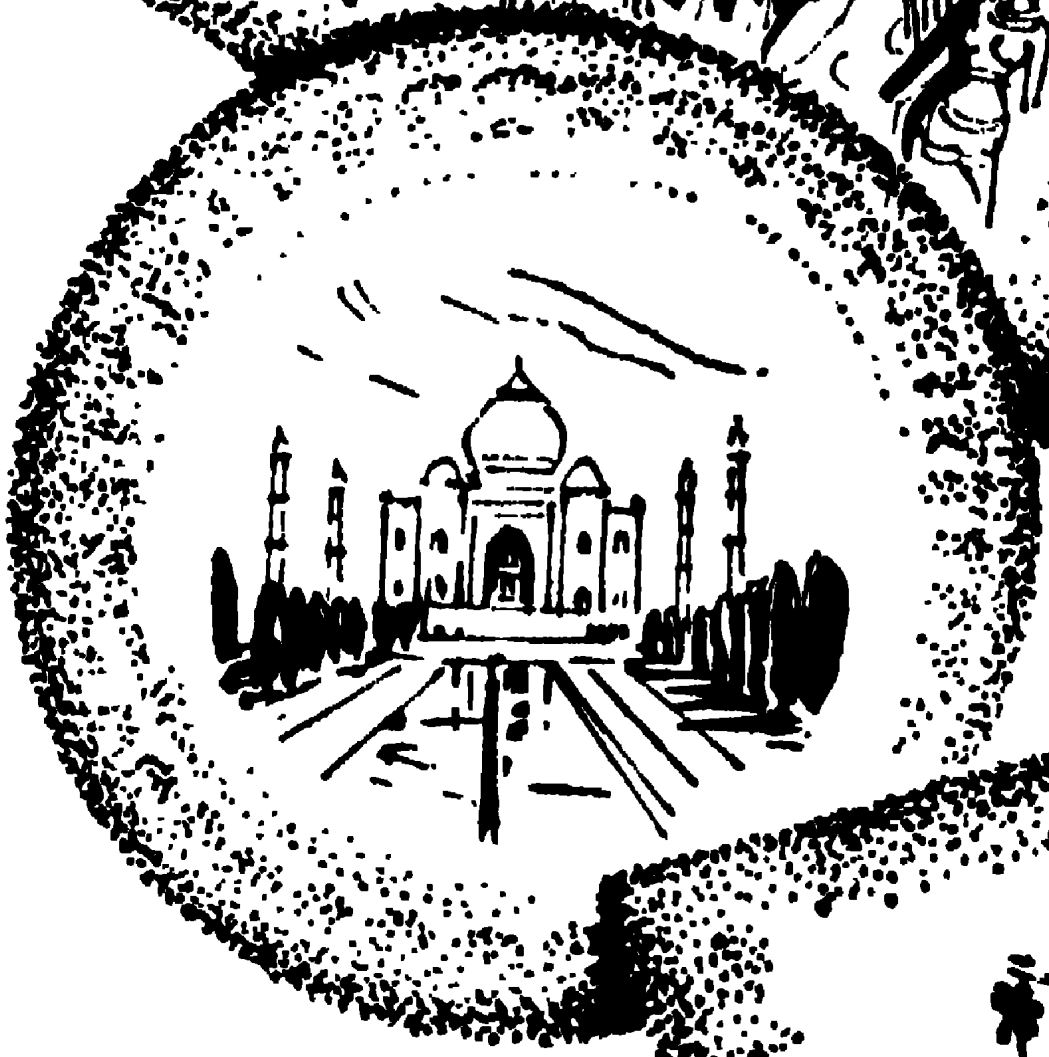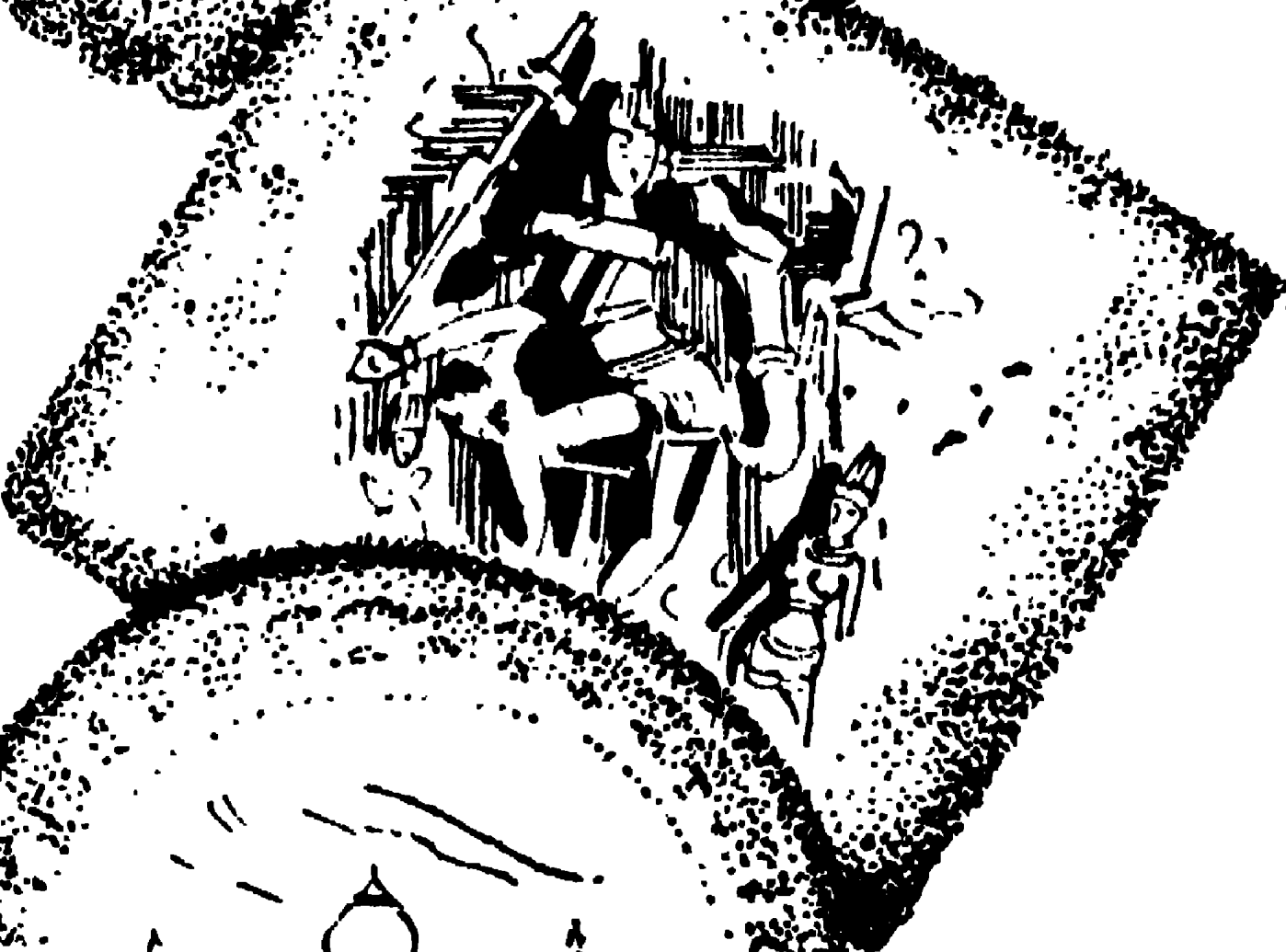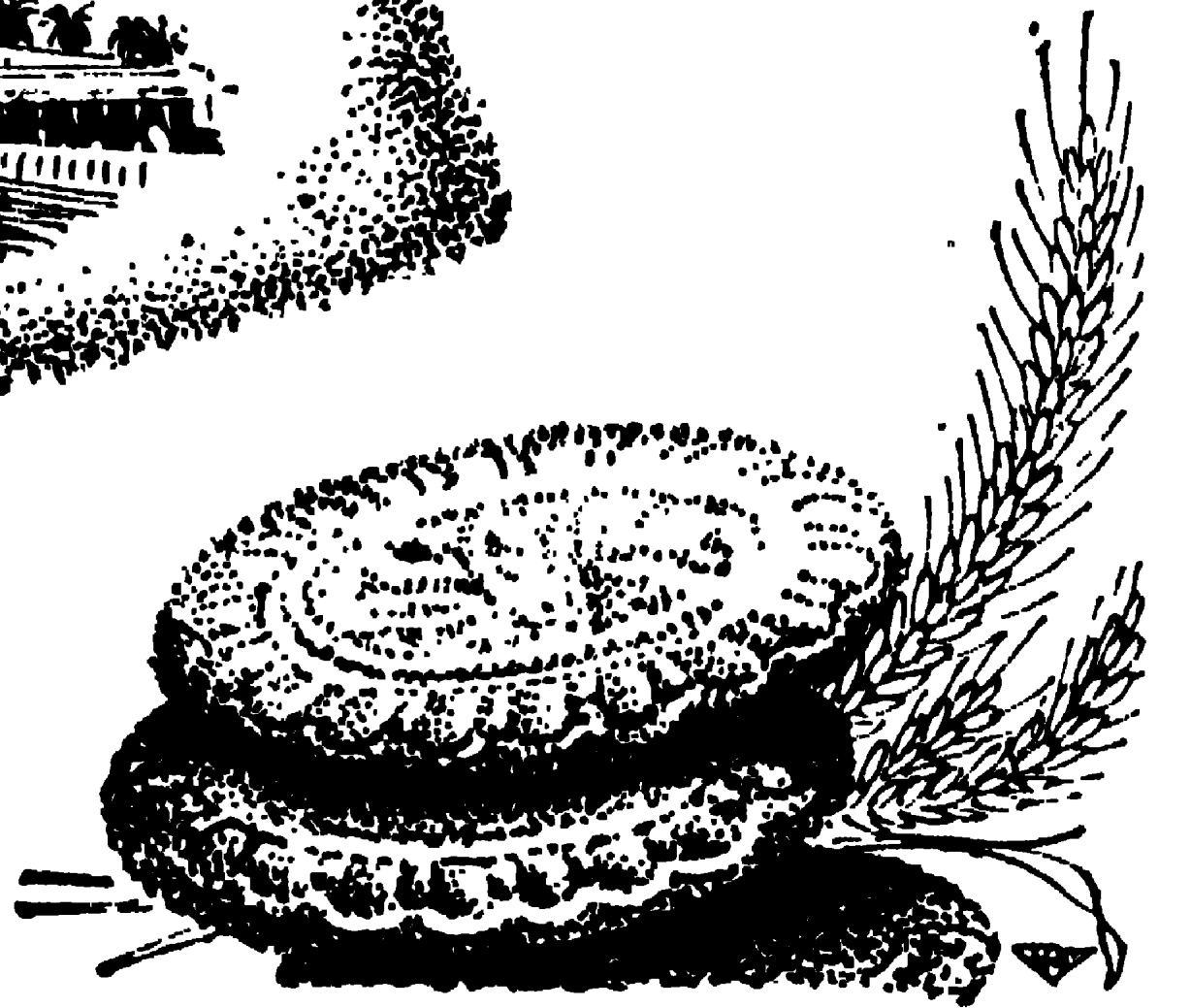
রোডফাইণ্ডার
সাইকেল
টায়ার ও টিউব
ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেড
কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • কানপুর • মাদ্রাজ • কোট্টিয়াম

খাস জন
কেরোসিন কুকার
PATENT NO. 62354 OF—'57

ফাল্গুন—১৩৬৭

সম্পাদক

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা—৬

মূল্য—এক টাকা

সহঃ সম্পাদক——শ্রীকল্যাণ রায়

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতাস্থিত, ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

BHRINGOL
MAHA BHRINGARAJ OIL
মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও
সুনিদ্রার সহায়তা করে
ভৃঙ্গল শুধু যে কেশের পক্ষেই বিশেষ উপকারী তাহা নহে,
ইহা মস্তিষ্ক সুস্থ ও শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার সহায়তা করে
ভৃঙ্গল
সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯
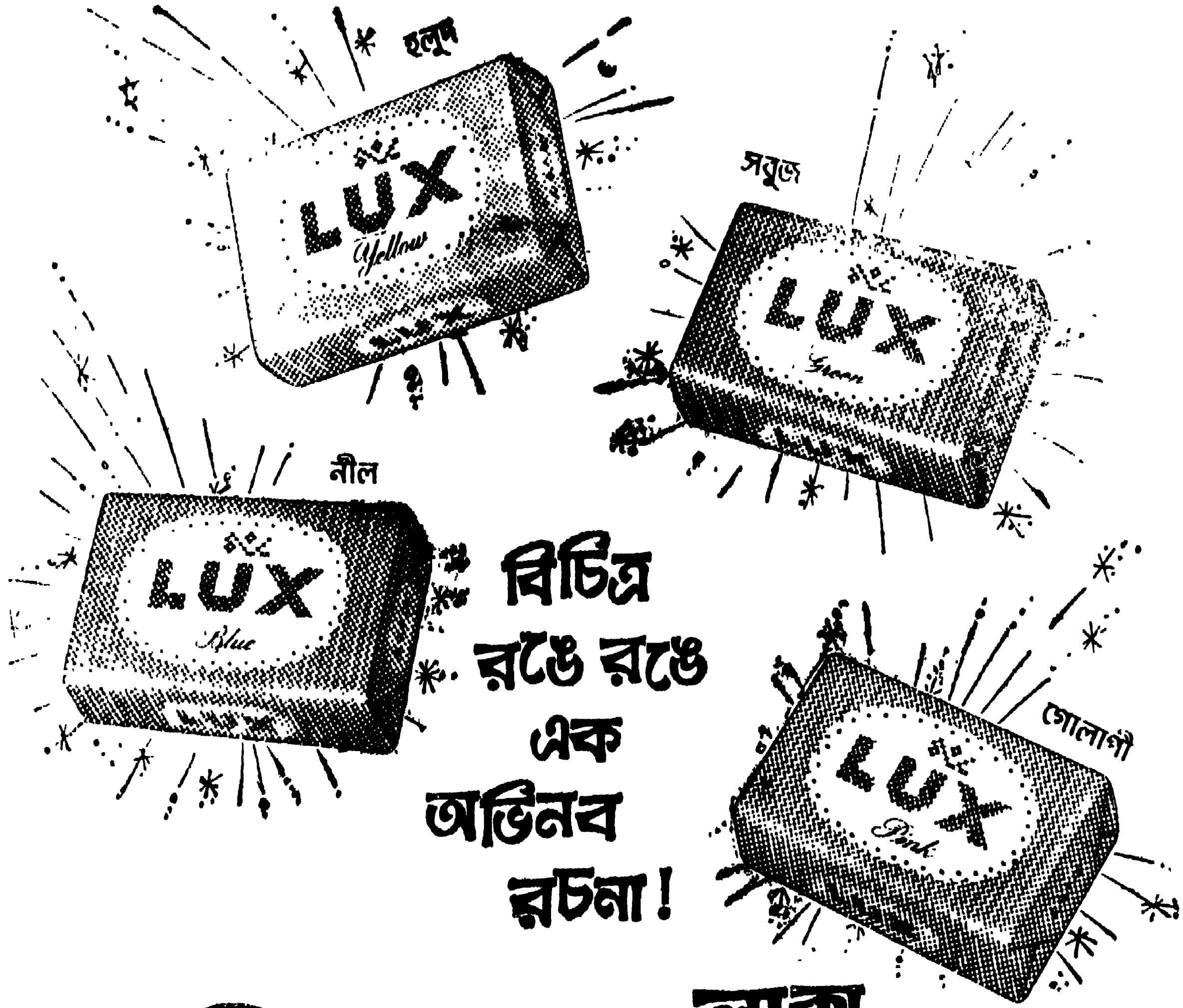
হলুদ
LUX
Yellow
সবুজ
LUX
Green
নীল
LUX
Blue
গোলাপী
LUX
Pink
বিচিত্র
রঙে রঙে
এক
অভিনব
রচনা!
বিশুদ্ধ কোমল লাক্স এবার
৪টি রামধনু-
আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!
লাক্স দেখুন! বিচিত্র বরণ আর মানানসই রঙীন মোড়ক!
সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার অতি প্রিয় বিশুদ্ধ লাক্স—
চেহারার যত্ন নিতে যে সাবান আপনি চিরদিনই চেয়েছেন।
"এই বিচিত্র রঙের
মেলা থেকে আপনার মনের
মতো রঙ বেছে নিন!"
ওয়াহেদা রেহমানও
সেই কথাই বলেন
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

।। এই সংখ্যায় ।।

॥—এই সংখ্যায়—॥

এই সংখ্যায়

মডার্ণ
৬৫ এ, ডব্লু, সি,

তা-৬ ফোন-৫৫-২৫৪৯

শিল্পে নতুন নতুন উদ্ভাবন

বিশেষ অধ্যবসায় ও কর্ম্মনিপুণতার জন্য বাঙ্গালোরস্থিত ভারতীয় টেলিফোন শিল্পের অন্যতম কর্ম্মী শ্রী এম, পি, দোরাইস্বামী সম্মানিত হয়েছেন। অর্দ্ধকুশলী কর্ম্মী হিসেবে কাজে যোগ দিয়ে উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে দোরাইস্বামী একজন কুশলী যন্ত্রনির্ম্মাতা হয়েছেন।

ভারতীয় টেলিফোন শিল্পকে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের জন্য প্রয়োজনীয় জটিল ধরণের একটি স্প্রিং বিদেশ থেকে আমদানী করতে হোত। তাঁরা নিজেরাই যাতে এই স্প্রিং তৈরী ক'রে নিতে পারেন সেজন্য চেষ্টা করতে থাকেন। দোরাইস্বামী বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে চেষ্টা ক'রে একটি যন্ত্র তৈরী করতে সমর্থ হন। এতে, দিনপ্রতি স্প্রিংয়ের উৎপাদন দশগুণ বেড়ে গেছে এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সাহায্য করেছে।

দেশের শিল্পপ্রগতি ত্বরান্বিত করার কাজে দোরাইস্বামীর মতো অধ্যবসায়ী কর্ম্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করেন। তাঁরা নতুন ভারত গঠনে সাহায্য করছেন।

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসংখ্য কোষের সমবায়ে শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে; তাই রক্তকে প্রাণধারার প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতঃই বিবিধ কঠিন ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

সারিবাদি সালসা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবত জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদি সালসা সেবনে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, খোস, পাঁচড়া, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, লিভারের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ নূতন রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধ

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-সি-এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম-বি-বি-এস (কলিঃ), আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য। ৩৬ গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ স্পর্শে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
আয়ুর্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
HIMKALYAN
অন্যান্য প্রসাধনী
• পাসিকোকো সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যাণ ক্যাষ্টর অয়েল সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা
UPCO
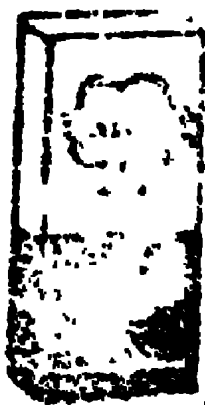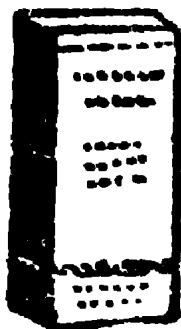
ষোড়শ বর্ষ

নবম সংখ্যা

ফাল্গুন

১৩৬৭

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

ফাল্গুনী শুক্লাদ্বিতীয়া ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি। যে বিরাট ঊর্দ্ধমূল অধোশাখ ধর্মদ্রুম সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া স্নিগ্ধ পল্লবচ্ছায়ে স্বার্থান্ধ কামনা বাসনার দাবদগ্ধ অসংখ্য নরনারীকে পরমাশ্রয় প্রদান করিয়াছে, এই বিশেষ দিনে তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল। অনির্বচনীয়ের সেই অপূর্ব প্রকাশের অঙ্কুর লোকচক্ষুর অগোচরে ভারতের তথা জগতের সমস্ত বিশিষ্ট সাধনধারার পুণ্যবারিসেচনে পল্লবিত বিকশিত ও ফলপুষ্প সমন্বিত বিশাল মহীরুহে পরিণত হইল। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে যে পরমাশ্চর্য ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে, দেশকালের ব্যবধানে ইহা তাহারই আর এক বিচিত্র পুনরাবৃত্তি। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমরা ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেছি। আমরা বুঝিতেছি, ভারতীয় সভ্যতার প্রথম শৈশবে ধ্যানসিদ্ধ ঋষিকণ্ঠে মানব জাতিকে অভয় দিয়া যে অমৃত বাণী উৎসারিত হইয়াছিল, যাহা বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র অবস্থার মধ্যে নানা মহাপুরুষের কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ বিঘোষিত হইয়াছে, তাহাই পুনরায় আর এক অলৌকিক চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণীর পতাকাবাহী স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাপুরুষ সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছিলেন, * * * কালবশে নষ্ট সনাতন ধর্মের সার্বভৌমিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া লোকসমক্ষে সনাতন-ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"...এই নবযুগধর্ম সমগ্র জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নবযুগপ্রবর্তক শ্রীভগবান পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম প্রবর্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

"মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গত রাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার একদেহ ধারণ করে না। হে মানব, আমরা মৃতের পূজা হইতে তোমাদিগকে জীবন্তের পূজায় আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।

"যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনা কর, এবং বৃথা সন্দেহ দুর্বলতা দাসজাতি সুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর!"

হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণ কর বলিয়া যে মহা সমন্বয়বার্তা বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন, তাহারই ভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মধ্যেই আমরা দেখিলাম, ভারতের সাধনা, সর্বমানবের মুক্তিরই সাধনা; হিংসা দ্বেষ দ্বন্দ্ব সন্দেহ ও অবিশ্বাস হইতে মুক্তির পথ নবযুগধর্মের আলোকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। যখন আমরা আদর্শকে বিভক্ত খণ্ডিত ও আংশিকরূপে গ্রহণ করিয়া, পরস্পরের সহিত নিষ্ফল বাদানুবাদে প্রবৃত্ত ছিলাম, যখন বৈষম্য ও ভেদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, যখন নষ্টবুদ্ধির দ্বারা বিকৃত ভ্রষ্টচরিত্রের দ্বারা কলুষিত হইয়া সমস্ত প্রচেষ্টাই বিপথগামী হইতেছিল, সেই সঙ্কটের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত ভেদবুদ্ধির মীমাংসা করিয়া, বিচিত্র ও বিশিষ্ট সাধনাগুলিকে এক সমন্বয়ের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান দিয়া আদর্শের সুনির্মল পরিপূর্ণরূপ স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিলেন। তাঁহার হিমগিরি-সন্নিভ মহোচ্চ জীবনের শিখরমালা হইতে বিনিঃসৃত মহাভাব মন্দাকিনীর সহস্র ধারা, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ধূর্জটির মত মস্তক পাতিয়া ধারণ করিয়াছিলেন। তারপর সেই প্রবাহকে তিনি জগৎ উপপ্লাবী এক মহাভাববন্যারূপে দেশ-বিদেশে বহাইয়া দিয়াছেন। জগতের তথা ভারতের উপর দিয়া কত ধর্মের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন বিচিত্র বিশাল সর্বগ্রাসী সার্বভৌমিক রূপ কোন তরঙ্গই আমাদের দেখায় নাই, এমনভাবে সকল দেশের সকল জাতির আপামর সাধারণকে আহ্বান করা হয় নাই। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সত্যের এই যে বিশ্বজনীন রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, ইহার উদার বিস্তৃতির মধ্যে আমরা মহাভারতবর্ষকে তাহার যুগ যুগ সঞ্চিত গৌরবের মধ্য দিয়া নূতন করিয়া অনুভব করিব—ইহাই নবযুগের সাধনা!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

স্বামিজী "ভারতীয় মহাপুরুষগণের" প্রসঙ্গ আলোচনায় ঠাকুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, * * 'এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের সময় হইয়াছিল, যাঁহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় বিরাজমান থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন—সকল সম্প্রদায় এক আত্মা এক ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত ও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতান্তর্গত এবং ভারত-বহির্ভূত দরিদ্র দুর্বল পতিত সকলের জন্য কাঁদিবে,

অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্ব সকলের উদ্ভাবন করিবে, যাহাতে ভারতান্তর্গত ও ভারত-বহির্ভূত সকল বিরোধী সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করিতে ও এইরূপ অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্য ভাবে উন্নতি সাধক সার্বভৌমিক ধর্মের প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। * *

সে অনেক কথা, এখন সময় নাই। সুতরাং আমি ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণ প্রকাশ স্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।"

পাশ্চাত্যদেশ হইতে স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরিয়া কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তরে স্বামিজী বলিলেন, "আপনারা আমার হৃদয়ের আর এক তন্ত্রী—সর্বাপেক্ষা গভীর তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছেন—আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম করিয়া যদি কায়মনবাক্য দ্বারা আমি কোন সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে, যাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই। তাহা তাঁহার। * * যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার শক্তির খেলা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্য, বন্ধুগণ জগৎ এখনো সেই নরবরের সহিত পরিচিত হয় নাই। আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিতেছি। এখন আমরা যে আকারে সেই সকল জীবনী পাইতেছি, তাহাতে শত শত শতাব্দী ধরিয়া শিষ্য প্রশিষ্যগণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনরূপ কলম চালানোর পরিচয় পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ঐ সকল মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতকে ঘসিয়া মাজিয়া কাটিয়া ছাটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন যেরূপ উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোন মহাপুরুষের তদ্রূপ নহে।

যে ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরায়, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, স্বামী বিবেকানন্দ তাহা স্বদেশে তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এবং এই মহাপুরুষের প্রেরণায় তিনি আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সহযোগিতার ভাবী যুগের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি সর্বমানবকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। ভারত এই আহ্বান শুনিয়াছে, ভারতের প্রসুপ্ত মনুষ্যত্বকে পুনরায় অদ্বৈতবেদান্তের ভেরী নিনাদে উদ্বুদ্ধ করিয়া "যত্র জীব তত্র শিব" এই মহামন্ত্রে যিনি দীক্ষা দিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, দুর্নীতি বৈষম্য ও ভেদের পঙ্কিল আবর্ত হইতে ভারতের মনুষ্যত্ব নিষ্কলঙ্ক মহিমায় উত্থিত হইয়া পুনরায় বিশ্বমানবের মহাসম্মেলনে যথাস্থান গ্রহণ করিবে। আমরা কি ইহা বিশ্বাস করি? আমরা কি ঠাকুরের জীবন ও বিবেকানন্দের বাণীতে বিশ্বাস করি, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈত্রিক শক্তি বিদ্যমান, যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনরস্ফুরণ হইবে।"

যখন দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী মিলনের পথ উন্মুক্ত হইল, যখন বিশ্বচিত্তে উদ্বোধনের মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, তখনই দেখিতেছি, স্বার্থবুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিতেছে। পাশববলে শক্তিমান পাটোয়ারী বুদ্ধির দুর্মতি দিকে দিকে উদ্ধত ভাবে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ইহাকে ধিক্কার দিবার মত নৈতিক বলের উপর যদি বিশ্বাস ও ভরসা না রাখিতে পারি, যদি দুর্বল দ্বিধায় আমাদের সংশয়াতুর চিত্ত শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কারের বোঝা ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে অক্ষম হয়, অন্যায় অশিবকে সর্বান্তঃকরণে অস্বীকার করিবার

শক্তির অভাব অনুভব করি তাহা হইলে আইস সকলে মিলিয়া অকৃত্রিম আকুতি লইয়া শরণাগতরূপে এই মহাশক্তির উৎস বিনিঃসৃত কৃপাবারি অঞ্জলি ভরিয়া পান করি। আর গললগ্নীকৃতবাসে বলি হে রামকৃষ্ণ, হে মহাশক্তির অনির্বচনীয় প্রকাশ, তুমি আমাদিগকে শক্তি দাও, এই ক্ষুদ্রতা, এই গভীর বন্ধন, এই তুচ্ছ আড়ম্বর, এই আত্মপরায়ণ স্বার্থান্বেষণের কদর্য চেষ্টা হইতে তুমি আমাদের দূরে বহুদূরে লইয়া যাও। যেখানে তোমার ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারী মানব-সন্তানগণ, সর্বমানবের মুক্তি সাধকরূপে বর্তমান মানব সমাজের হিংসা হত্যা, পরের অধিকার লঙ্ঘনের অধর্ম-দুঃসাহসিকতার সমস্ত জ্বালাময় পরিণাম ধৈর্যকঠিন বক্ষে ধারণ করিতেছেন, যেখানে অচল প্রতিষ্ঠ সত্যের উপর ভরসা রাখিয়া তাঁহারা বর্তমান জগতের স্বার্থমন্থনে উত্থিত গরলরাশি অম্লানবদনে পান করিতেছেন, সেই কঠিন কঠোর কর্মভূমিতে আমরাও দণ্ডায়মান হইব, বিশ্বাস রাখিব, তোমার কল্যাণেচ্ছার অবিচল মহিমায় প্রতিহত হইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষা, তুচ্ছ অহঙ্কার মস্তক অবনত করিবে। হে রামকৃষ্ণ, তোমার ভাবীযুগের সংগ্রামের কল্যাণশক্তি আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করিয়া সৈনিকের দৃঢ়তা প্রদান করুক। আমরা অগ্রসর হইব, তোমার পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিব, বক্ষশোণিতে সেই পতাকার উপর লিখিয়া দিব, নবযুগের আদর্শ—ত্যাগ ও সেবা।

মদীয় আচার্যদেবের নিকট আমি আর একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। উহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়—এই অদ্ভুত সত্য যে, জগতের ধর্ম্মসমূহ পরস্পর বিরোধী নহে। উহারা এক সনাতন ধর্ম্মেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এক সনাতন ধর্ম্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্ম্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব আমাদিগকে সকল ধর্ম্মকে সম্মান করিতে হইবে, আর যতদূর সম্ভব, সমুদয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্ম কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে বিভিন্ন হয় তাহা নহে, পাত্র হিসাবেও উহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধর্ম্ম তীব্র কর্ম্মশীলতারূপে প্রকাশিত, কাহাতেও প্রবলা ভক্তি, কাহাতেও যোগ, কাহাতেও বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। তুমি যে পথে যাইতেছ, তাহা ঠিক নহে, একথা বলা ভুল। এইটি করিতেই হইবে এই মূল রহস্যটি শিখিতে হইবে। সত্য একও বটে, বহুও বটে, বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখিতে পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পোষণ না করিয়া আমরা সকলের প্রতি অনন্ত সহানুভূতি সম্পন্ন হইব। যতদিন পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, ততদিন এক আধ্যাত্মিক সত্যই বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে, এইটি বুঝিলে অবশ্যই আমরা পরস্পরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি করিতে সমর্থ হইব।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীকালিদাস নাগ

প্রাচ্য-সভ্যতার পূর্ণ প্রতীক রবীন্দ্রনাথ আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যের জহুরী একথা আজ স্বীকৃত হলেও Nobel পুরস্কার প্রাপ্তির আগে তা কম ভারতবাসীই জানতেন। ১৯১১ সালে ৫০ তম জন্মোৎসবে Rev Milburn কবিকে গভীর শ্রদ্ধা জানান তা লিখেছি ও তাঁর প্রথম বিচক্ষণ ইংরেজ সমালোচক Rev Ed Thompson (1886-1906) বাঁকুড়া Weslyan College এ রবীন্দ্র পাঠ সুরু করেছেন। ১৯১২সালে সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত Town Hall-এর সভার পর বৎসর তাঁর ৫১ তম জন্মোৎসব আমরা করেছিলাম জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন দত্ত, দিনেন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতিকে নিয়ে। তার চার দিন পরে (১২ই মে ১৯১২) কবি তাঁর পুত্রবধূ ও পুত্রকে সঙ্গে করে তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। আমি প্রবাসী ও Modern Review অফিসে নিয়মিত গিয়ে দেশী ও বিদেশী পত্রিকাদির Press Cuttings রাখতে সুরু করলাম। ৪০ বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের (৪ঠা জুলাই ১৯০২) ঠিক দশ বছর পরে ৭১ বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথ ১৬ই জুন লণ্ডনে পৌছলেন। তখন লণ্ডন Royal College of Artsএর অধ্যক্ষ William Rothenstein (১৯১০ সালে তিনি জোড়াসাঁকো আসেন ও তাঁর স্মৃতিকথায় এসব ঘটনা লিখে গেছেন) তাঁর বন্ধু মহলে কবিকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি আইরিশ সাধিকা ভগ্নী নিবেদিতার অনূদিত কাবুলিওয়ালা গল্পটি Modern Reviewতে পড়ে মুগ্ধ হন। কেশবচন্দ্রের শিষ্য প্রমথলাল সেন ও ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীল ১৯১১-১২ সালে লণ্ডনে ছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিম-যাত্রায় উৎসাহিত করেন; ডাঃ শীল Universal Race Congress এর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন; সেটির প্রথম ও শেষ রিপোর্ট দেন ভগ্নী নিবেদিতা, তিনিও তাঁর গুরু বিবেকানন্দের মত অকালে চলে গেলেন (১৯১১)। কবির প্রাণস্পর্শী প্রবন্ধ 'ভগ্নী নিবেদিতা' আমরা প্রবাসীতে পড়েছি ও Modern Reviewতে নিবেদিতার শেষ রচনা 'নীল পাখী' (Blue Bird) বেলজিয়ামের Nobel Lauriate Materlinke এর সমালোচনা পড়ে মুগ্ধ হই। ১৯১২ সালে মেটারলিংক Nobel পুরস্কার পান ও সেই সময়ে প্রকাশিত ডাকঘর নাটকে তাঁর প্রভাব লক্ষিত হয়। আইরিশ কবি প্রখ্যাত W. B. Yeats যে ইংরেজী Gitanjaliর (India Society, London 1912) মুখবন্ধ লেখেন ও সেই বই নোবেল পুরস্কার পেয়ে (নভেম্বর ১৯১৩) পূর্ব ও পশ্চিমের সংঘর্ষ থামিয়ে বিরাট সমন্বয়ের পথে সবাইকে এগিয়ে দিয়েছিল। বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথই সেই সমন্বয়ের সার্থক নেতা ও পথিকৃৎ ও দ্রষ্টা-ঋষি (Seer)। তাই নৈবেদ্য খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে সংকলিত কাব্যের স্বনির্বাচিত ও নিজহস্তে ইংরেজীতে অনূদিত Gitanjali জগতের বিস্ময় জাগিয়েছিল ও আজও জাগায়। সেকালে কবি তাঁর গদ্য ও পদ্য বহু রচনা নিয়ে নিজের মত রূপান্তরিত করেছেন ইংরেজীতে সবাই আমরা জানি। কিন্তু ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত অনর্গল বাংলায় কলম চালিয়ে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ Bilingual (দ্বিভাষিক প্রতিভা) দেখালেন কি করে?

এ প্রশ্নের জবাবও সাধারণে না পেলে গীতাঞ্জলির বিশ্ববিজয় দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে থাকবে তাই সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু লিখছি। গবেষণার বিরাট ক্ষেত্র এখানে পড়ে আছে, কিন্তু বাংলার তথা ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় এ কাজে নামেন নি—রবীন্দ্র শতাব্দী উৎসবে সে দুঃখ না জানিয়ে উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পাশও করেন নি; তাই আজ অবধি হয়ত অনেকের ধারণা তিনি ইংরেজী শেখেন নি। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য ত দূরের কথা—ইংরেজীও তিনি ভাল করে শেখেননি এটি মহাভ্রম; তাহলে কোন্ মায়ামন্ত্রে (Magic) তিনি Gitanjali, Gardner থেকে সুরু করে Sadana (Harvard বক্তৃতা) ও Religion of Man প্রভৃতি গভীর রচনা ইংরাজীতে প্রকাশ করে পৃথিবীব্যাপী সাড়া কি করে তুলতে পারেন? মাসিক পত্রিকার ছোট প্রবন্ধে এসব ব্যাপার ভাল করে আলোচনা সম্ভব নয়। তবু তাঁর ৫০ থেকে ৮০ অর্থাৎ জীবনের শেষ ৩০ বৎসর তাঁর সঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়, তাই অলিখিত এক থীসিস (Thesis) এর আভাষ আজ দিয়ে যাই।

রবীন্দ্র জন্মের পর বৎসর তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) বিলাত যাত্রা করেন ও তাঁর সহযাত্রী হন স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন (১৮২৪-৭২) যাঁর অকাল মৃত্যুর (৪৯ বছর) পর সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ডায়েরী বা চিঠিপত্রে Captive Lady ও মেঘনাদ বধ রচয়িতা সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন কিনা তার সন্ধান করা হয়নি; কিন্তু শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী (১৮৭৩-১৯৬০) তাঁর বাবা ও মা জ্ঞানদানন্দিনীর কিছু চিঠি প্রকাশ করে গেছেন। তাঁদের সঙ্গেই ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাতযাত্রা করেন (১৮৭৮-৮১) ও ইউরোপ প্রবাসীর পত্র রচনা করেন। তখনকার "ভারতী" পত্রিকায় দেখি কিশোর রবি Anglo Saxon এবং Anglo Norman সাহিত্য অবলম্বনে দুটি প্রবন্ধ ও মূল কাব্যের তর্জমা ছেপেছেন! আর বালক অভিনেতা রবি তার বহু ভাষাবিদ দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৯-১৯২৫) উৎসাহে শুধু ইংরেজী নয় ফরাসীও পড়তে সুরু করেন; কারণ "কৈশোরক" গ্রন্থে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ কৃত Hugo Musset ও Lamertine প্রভৃতি ফরাসী কবিদের অনুবাদ ছেপেছেন। ইংরেজ কীট্‌স ও শেলী ব্রাউনিং ও সুইন্‌বার্ণ ত তাঁর মুখ থেকেই আমরা শুনেছি আবৃত্তি করতে। কলেজের অধ্যাপকদের নোট্‌ টুকেও যা বুঝিনি তার চেয়ে গভীরতর অনুপ্রবেশ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়ে গেছেন। আর সেকস্‌পীয়র তাঁর এত প্রিয় যে "ম্যাকবেথ" এর মত কঠিন নাটক স্কুল ছাড়ার আগেই সুষ্ঠু অনুবাদ করেন—ডাইনীদের গান রবীন্দ্র অনুবাদে আজ প্রসিদ্ধ। ১৮৭৮-৮১ তিন বছরে তিনি ভাল ভাল নাটক ও অপেরা লণ্ডনে দেখেন ও Henry Morleyর মত পণ্ডিত অধ্যাপকের তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শুধু সাহিত্য নয় বিজ্ঞান ও দর্শনের কত বই পড়েছেন তার হিসাব কেউ রাখেনি কিন্তু ১৮৮১-৯১ (সাধনা প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত) এই দশকে রবীন্দ্রনাথ Herbert Spencer ও তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিতদের চিন্তাধারা অনুসরণ করে ভারতী ও সাধনা পত্রিকায় লিখেছেন। দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণ সেরে (১৮৯৩) ডায়েরী ও "পঞ্চভূত" (ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমদের সরল বাক্যালাপ) রম্য সাহিত্যের (Belles Letters) আদি রচনা অধ্যাপক Lowes Dickeson এর গভীর রহস্য প্রাণ এই বই খানি "চীনে ম্যানের" চিঠিতে রূপান্তরিত করে ভারতের সঙ্গে চীনের মৌলিক চিন্তায় মিল রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন; তাই বিবেকানন্দের দেহত্যাগের আগে (১৯০১-২) ভগ্নী নিবেদিতা ও জাপানী মনীষী Count Okakura রচিত—Ideals of the East বইখানি ঠাকুর বাড়ীতে বসে যখন লেখা তখন অবনীন্দ্রনাথ শিল্পে নবজাগরণ সুরু করছেন। ইংরেজ Havell সাহেব ও সিংহলী দেশ-প্রেমিক কুমারস্বামী "Art and Swadeshi" রচনা সুরু করছেন। ঠাকুর পরিবারে রম্য-সাহিত্য ও শিল্পকলার আদর সমানভাবেই চলেছিল। তাই ১৯০৯—১০ সালে—

অর্থাৎ তৃতীয় বিলাত যাত্রার আগেই সুরজ্ঞ Fox Strang-way ঠাকুর-বাড়ীতে মার্গ সঙ্গীত শুনে স্বরলিপিসহ Music of Hindusthan প্রকাশ করেন। তেমনি শিল্পীপ্রবর Rothenstein জোড়াসাঁকোয় এসে কবি যে শ্রেষ্ঠ গল্প রচয়িতা সেটি আবিষ্কার করেন ; তাঁর ঘরেই প্রথম গীতাঞ্জলি পাঠচক্র বসে এবং তার ফলে এসিয়ায় প্রথম Nobel Prize এল (নভেম্বর ১৯১৩)। তখনও তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত (১৮৭১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চলছে ৭০ বছর ধরে। আমরা সাগ্রহে "তত্ত্ববোধিনী" পড়ি, কারণ কবি নিজে সম্পাদক ও বন্ধু অজিৎকুমার চক্রবর্ত্তী সহ-সম্পাদক।

প্রায় প্রতি মাসে চিঠি অথবা পত্র-প্রবন্ধ গুরুদেব পাঠাচ্ছেন অজিতকে আর তিনি আমায় পড়তে দিচ্ছেন যেমন দিতেন দ্বিজেনমামা (Dr. D. N. Maitra) Mayo হাঁসপাতালে। Gitanjaliর ভূমিকা লেখার সময় Yeatsকে অনেক সাহায্য করেন ডাঃ মৈত্র। সেই পাশ্চাত্য জয়যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ যেমন পান তরুণ আইরিশ কবি Yeatsকে, তেমনি প্রবীণ সাহিত্যিক Milton-এর ভাষ্যকার অধ্যাপক Stopford Brookeকে পিতামহ ভীষ্মের মত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম ইংরাজী জীবনী ছাপেন বিখ্যাত Every Man's Library সম্পাদক Ernest Rhys। কিন্তু তিনি বাংলা না জেনে অনেক ভুল করেছেন দেখে বাঁকুড়ার অধ্যাপক Thompson সুরু করেন মূল রবীন্দ্রকাব্য পড়তে (১৯১০- ২২) তিনি ছিলেন বাঁকুড়া Wesleyan College এর অধ্যাপক এবং বাঙালী পণ্ডিতের সাহায্যে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের শাক্ত-সঙ্গীতাদি পড়ে একটি বই ছাপান ও Y. M. C. A. প্রকাশনীর তাগাদায় (ভুল থাকলেও) বাংলার সাহায্যে টম্‌সন্ 'Rabindranath Tagore' প্রকাশ (১৯২০) করেন (এর সংশোধিত শতাব্দী সংস্করণের ভার আমার উপরে এসেছে) এই বইখানি পরে বড় করে Tagore Poet and Playwright (Oxford University Press) প্রকাশ করেন ও Dr. Thompson Oxford-এ বাংলা অধ্যাপনার ভার পান। মৃত্যুর ঠিক আগে তার সংশোধিত সংস্করণ ছাপাতে দিয়ে আমাদের—বিশেষ করে তাঁর বন্ধু অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশকে কৃতার্থ করেন। 'বিদায় অভিশাপ' ও 'উর্বশীর' মত কঠিন রবীন্দ্ররচনা তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করে গেছেন তাঁর কথা পরে বলব। তেমনি Rev. C. F. Andrews ও "গোরা" অনুবাদক অধ্যাপক W. W. Pierson ও শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়ে আজীবন রবীন্দ্র সেবায় আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করে গেছেন। পূর্ব ও পশ্চিমের এই সখ্য ও সহযোগিতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ এই দুই ইংরেজ বন্ধুদের কবি পশ্চিম দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ সংগ্রামে সাহায্য করতেন (১৯২৩)।

ইংরেজী গীতাঞ্জলীর ভাষা ইংরেজ সাহিত্যিকদেরও বিস্ময় জাগিয়েছিল ; আমেরিকার প্রগতিশীল কবি Ezra Pound তখন এক বড় প্রবন্ধ লেখেন ও Chicago Poetry পত্রিকা সম্পাদিকা Harret Monroe সে দেশে কয়েকটি রবীন্দ্র অনুবাদ ছাপেন, তাঁর নিজের কাছে শুনেছি। এখনো জীবিত ৮৭ বর্ষীয় মার্কিন কবি Robort Frost ১৯১২—১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের দর্শন পান এবং প্রথম মার্কিন Nobel Lauriate Sinclair Lewis রবীন্দ্রসম্বর্দ্ধনা সভায় আগে অভিনন্দন করে যান তাঁর বন্ধু গোষ্টির ভোজে সেটি স্বচক্ষে Newyorkএ দেখেছি—সেই ১৯৩০-৩১ সালেই কবির শেষ আমেরিকা যাত্রা। ইতিপূর্ব্বে ১৯২৪ সালে তিনি Argentina যাত্রায় অসুস্থ হয়ে ফিরে আসেন।

মার্কিন দেশের নরনারী Macmillan Co প্রকাশিত লক্ষ লক্ষ রবীন্দ্র গ্রন্থ কিনেছে ও পড়েছে। তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি Canada-U. S. A. থেকে Latin America পর্য্যন্ত ভ্রমণকালে (১৯৩০-৬০) দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম অনুবাদ হয় স্পানী ও পর্তুগীজ ভাষায়। কিন্তু বাংলা না জানায় তারা ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ

পড়েই মুগ্ধ! ফরাসী শিল্পী Andre Gide তাঁর কলমের যাদু দিয়ে ফরাসী Gitanjali'ও বিরাট প্রচার করেন। কিন্তু মূল বাংলা কাব্য কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও উচ্চস্তরের সেটি দেখাবার জন্য Romain Rolland ও তাঁর ভগ্নী মাদলেনের অনুরোধে (ইনি আমার কাছে বাংলা শেখেন ও চতুরঙ্গ অনুবাদ করেন) আমি প্যারিস ছাড়ার আগে P. J. Jouveএর সঙ্গে মিলে 'বলাকা'র ছত্রে ছত্রে আক্ষরিক অনুবাদ করি, সেটি পড়ে বিশেষ প্রশংসা করে বলেন "The Unknown Tagore"! (এ বিষয়ে অধ্যাপক নীরেন রায় লিখেছেন)।

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। রুশ রাষ্ট্র ও জনসংঙ্ঘ সেটি বুঝে তাঁদের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের সব গদ্য ও পদ্য রচনা মূল বাংলা থেকে অনুবাদ করিয়ে বহু লক্ষ কপি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন এবার U S S R ঘুরে দেখে গভীর আনন্দ পেলাম।

তাই বাংলা ভাষা হতে চলল এক জাগতিক ভাষা বাণীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথেরই আশীর্বাদে। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। এই কথা লিখলাম 'গীতাঞ্জলি'র দিগবিজয় উপলক্ষ্যে।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল তোমাকে আমরা পেয়েছি—সেই দিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ঐ একই কথা আওড়াতে চায় যে, তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা তুমি যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসবটি ক'রছ তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোন গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে তবেই যথাথভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয় তা বলতে পারিনে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়—তেমনি মানুষকে বার বার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়। একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম—কোন রহস্যধাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলুম কে জানে। কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখ-দুঃখ ও স্নেহ প্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতন ক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপ-মায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম, তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মত আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও একত্র কত লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে! সেই জন্যেই আজকের এই আনন্দ।

—রবীন্দ্রনাথ।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

দশ

মালার মন থেকে কিছুতেই যায় না যে মায়াপাহাড়ের অবস্থান পঞ্চনদীর তীরে। আর কয়েক কদম এগোলেই সেখানে পৌছনো যেত। সেই ক'টি পদক্ষেপ থেকে তার মা তাকে বঞ্চিত করলেন। তাই মুক্তা ঝরার জল আর সোনার শুকপাখী হাতের কাছে এসেও হাতের নাগালের বাইরে থেকে গেল।

এ কথা তো সে মাকে বাবাকে খুলে বলবে না। নোয়াখালী সে কেন গেল, সেখানে কী করে এলো তাও তাঁদের জানায়নি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে সে গান্ধীজীর মতো শান্তিস্থাপনের ব্রতে নিযুক্ত ছিল। গান্ধীজী আপাতত সেখানে নেই বলে চলে এসেছে। গান্ধীজী এখন দিল্লীতে। পরে হয়তো লাহোর যাত্রা করবেন। তাই মালারও গতি সেইদিকে। তাঁদের কিন্তু সম্মতি নেই তাতে। পাঞ্জাবে যা ঘটেছে তা অমানুষিক। যেমন মুসলমান তেমনি শিখ কেউ কম মারেনি, কম ধরেনি, কম কাড়েনি, কম পোড়ায়নি। হিন্দুদেরও 'অবদান' নগণ্য নয়। তারাও কারো চেয়ে কম পালায়নি।

মেসোমশায় মালাকে বোঝান, "আমরা এখন ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক। সীমান্তের অপর পারে আমরা যেমন অসহায় তেমনি অনধিকারী। তারাও কি এ পারে যখন খুশি আসতে পারে? লাহোর যাব বললেই তো যাওয়া হয় না। তা যদি হতো গান্ধীজী দিল্লীতে পায়চারি করতেন না। সবুর কর। অবস্থা শান্ত হোক। তার পর যাবে।"

তার পর যাবার দরকার কী থাকবে? মানুষ বিপন্ন বলেই না যাওয়া। মালা আপনাকে বাঁচাতে চায় না। চায় পরকে বাঁচাতে। বিশেষ করে মেয়েদের উদ্ধার করতে। দু'পক্ষই নাছোড়বান্দা যে, যতক্ষণ এরা না ছাড়ে ততক্ষণ ওরা ছাড়বে না। যতক্ষণ ওরা না ছাড়ে ততক্ষণ এরা ছাড়বে না। দু'পক্ষই রাবণ।

আমিও তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। সে বুঝেও বোঝে না। রূপকথার জগতে সীমান্ত নেই। রাজপুত্র ঘোড়া চালিয়ে দেয় অবাধে। কিরণমালাকে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়নি। মায়াপাহাড়ের মায়া সরকার আপত্তি করেনি। বোধহয় টের পায়নি। টের পেলে কি সোনার শুকপাখী বিনা মাশুলে পাচার করতে দিত?

"এটা রূপকথার জগৎ নয়।" আমি ধুয়ো ধরি।

"তা হলে এটা কিসের জগৎ?" মালা প্রশ্ন করে।

মামুলি উত্তর দিতে আমার বাধে। তলিয়ে দেখলে রহস্যের কূলকিনারা পাইনে। কোটি কোটি সূর্য তারা নীহারিকার দিকে তাকাই, যাদের শাদা চোখে দেখা যায় না সেইসব অণু পরমাণুর দিকেও। বাস্তব কি কেবল মানুষের ক্ষুদ্র সংসারযাত্রা? এ বাস্তব কি দিন ফুরোলে অবাস্তব নয়? হাজার হাজার বছর পরে আজকের বাস্তবের মূল্য কী? মূল্য যদি কারো থাকে তবে সে ওই রূপকথার।

"এটা কিসের জগৎ সে কি আমি এক কথায় বলতে পারি, মালা?" আমি সোজাসুজি উত্তর দিতে

অক্ষম হয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলি, "একে প্রকাশ করতে হলে, অমর করতে হলে রূপকথার প্রয়োজন হয়, সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এতে বাস করতে হলে, প্রাণধারণ করতে হলে রূপকথায় বা সঙ্কেতে কুলোয় না। তার জন্যে চাই বাস্তববোধ। পদে পদে খেয়াল রাখতে হয় যে এটা রূপকথার জগৎ নয়।"

উপদেশের মতো শোনায়। যে কোনো সংসারী বিজ্ঞলোক যে ভাষায় কথা বলে থাকেন। মালা বুঝতে পারে যে তাকে প্র্যাকটিকাল হতে বলা হচ্ছে। সে আপত্তি করে না। বলে, "বাস্তববোধ যদি আমার না থাকে তবে আমি তা অর্জন করতে রাজী! তা বলে যেটা আমার আছে সেটা কেন বর্জন করব? বার বার আশাভঙ্গ মোহভঙ্গ ঘটবে। তা সত্ত্বেও পদে পদে স্মরণ রাখব যে এটা রূপকথার জগৎ।"

মালা আমাকে দিনে দিনে তার মায়াপাহাড়ের অভিযান কাহিনী শোনায়। ঘটনাগুলোর যে অংশটা পার্থিব সে অংশটা আমি বাদ দিই। যেটুকু অপার্থিব সেটুকু নিই। তার সঙ্গে আর কিছু মেশাই, যেটা পার্থিবের দ্যোতনা জাগায়। এমনি করে মায়াপাহাড়ের অভিযান কাহিনী চিত্রে রূপান্তরিত হয়। নোয়াখালী চাক্ষুষ করিনি। তার জন্যে ছবি আঁকা আটকায় না। আমি তো নোয়াখালীর বিবরণী সচিত্র করতে বসিনি। আমার পদ্ধতিটাও বাস্তবধর্মী নয়। তার জন্যে অন্য লোক আছে। তাদের বরাত দিলে তারা এমন চমৎকার করে আঁকবে যে মনে হবে যেন অবিকল নোয়াখালীর ঘরবাড়ী পথঘাট ধানক্ষেত মাঠ। আর একালের বর্গার হাঙ্গামা। আর তারই মাঝে একটি পথচারী বৃদ্ধ। একালের বৃদ্ধ।

না। আমার এসব ছবিতে অবিকল বলে কিছু নেই। সেইজন্যে সকলের ভালো লাগে না। সকলের জন্যে আমি বাঁ হাতে পোস্টার আঁকি। বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকি। তা দিয়ে আমার সংসার চলে। আর ডান হাতে আঁকি যা আমাকে অমর করবে। আমাকে না করুক আপনাকে অমর করবে।

মালা আমার ছবিগুলো দেখে বলে, "হাঁ। হয়েছে।"

এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে! এই তো রসবিচারের শেষকথা। আমি নোয়াখালীও দেখিনি, মালাও নই, অভিজ্ঞতাগুলোও আমার নিজের নয়। তবু যা এঁকেছি তা "হয়েছে"। অন্তত মালার চোখে।

মালাকে আমি ছবি দেখাতে দেখাতে একটু একটু করে ভুলিয়ে নিয়ে যাই লাহোরের পথ থেকে। সে আর বাড়ী ছেড়ে বাহির হবার কথা মুখে আনে না। বোধহয় মনেও আনে না। মাসিমা ও মেসোমশায় তাকে যেতে দেননি বলে সে আর অশান্ত বা বিমর্ষ নয়। মুক্তা ঝরার জল আর সোনার শুকপাখী আনা হলো না বলে বিষাদ বোধ করে না। অরুণ বরুণ পাথর হয়ে গেছে, কত রাজ্যের রাজপুত্র পাথর হয়ে গেছে, তাদের জীবন দিতে হবে বলে ব্যাকুল বোধ করে না। এক কথায়, সে আর কিরণমালা নয়। সে মালা হয়ে গেছে।

তাই যদি হলো তবে আর রূপকথার রাজপুত্রের জন্যে প্রতীক্ষা করা কেন?

একদিন ওকে নিরালায় পেয়ে এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করি আমি। ও চমকে ওঠে। আমি ওকে আরো বড় চমক দিই। বলি, "তোমার চোখের সামনেই একটা পাথর পড়ে আছে। সে রাজপুত্র না হলেও তুমি তাকে জীবন দিতে পারো মুক্তা ঝরার জল তোমার ঝারিতেই আছে, মালা। সোনার শুকপাখীও আছে তোমার দাঁড়ে। তুমি কি তাকে বাঁচাবে না!"

মালা প্রথমটা বুঝতে পারেনি কার কথা হচ্ছে। কোন্ কথা হচ্ছে। বুঝল যখন তখন তার মুখে সিঁদুর লাগল। সে সলজ্জভাবে মুখ নত করল। তার পর মুখ তুলে চোখের কোণে তাকালো। তারপর আমাকে চমকে দিয়ে বলল, "তুমি রাজপুত্রই। রূপলোকের রাজপুত্র।"

তা হলে আর কী। আমার আশা আছে। মালার সঙ্গে আর একটি কথাও না। সেই দিনই মাসিমার সঙ্গে দেখা করি। একটু গৌরচন্দ্রিকার পর নিবেদন করি যে আমি তাঁর কন্যার অযোগ্য পাণিপ্রার্থী।

"তুমি!" মাসিমা বিশ্বাস করতে পারেন না। "তুমি। দেবপ্রিয়! মালার—" তিনি শেষ না করে কেঁদে ফেলেন।

আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে তিনি পাদপূরণ করবেন এই বলে, "মতো মেয়ে কি বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা হবে!"

তা নয়। তিনি কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, "তুমি যে আমাদের কত বড় বন্ধু তা এই বিপদের দিনে বুঝতে দিলে। ও মেয়ে কোন্ দিন না লাহোর চলে যায় সেই ভয়ে আমার চোখে ঘুম ছিল না। এ কি সত্যি! তুমি! দেবপ্রিয়! আশ্চর্য! কেন যে এ কথা কোনো দিন মনে হয়নি। কিসে তুমি কম? মালাকে বলেছ? সে কী বলে?"

এর পরে মেসোমশায়ের সঙ্গে কথা। মাসিমাই আমার হয়ে পাড়লেন। তিনিও তেমনি আশ্চর্য। তেমনি প্রীত। তেমনি সম্মত। আনন্দে আমাকে বুকে টেনে নিলেন।

আশ্চর্য হলো না শুধু একজন। সে আমার বোন নীলি। সে নাকি অনেক আগেই টের পেয়েছিল যে এইরকমই হবে। না হয়ে পারে না।

সম্প্রদান করলেন মেসোমশায় যথারীতি। কিন্তু সেইখানেই তাঁর কর্তব্য ফুরোল না। আমাদের দু'জনকে পাশে বসিয়ে তিনি নীরবে উপাসনা করলেন। মনে মনে কী বললেন, কাকে উদ্দেশ করে বললেন তিনিই জানেন। তিনিও ধ্যানস্থ, আমরাও তাই। আমি আমার রূপের দেবতাকে উদ্দেশ করে মনে মনে বললুম, এখন থেকে আমার পূজা তেমন ঐকান্তিক হবে না, প্রেমকে ভাগ দিতে হবে। কিন্তু তোমাকে যা উৎসর্গ করব তার মধ্যে এবার থেকে রসের সঞ্চার হবে, প্রেম মিশিয়ে দেবে রস।

বিয়ের পরে মালা আর আমি মধুমাস যাপনের জন্যে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু পশ্চিমমুখো হতে আমার ভয়। পাছে মালা বলে বসে, "দিল্লী চল। গান্ধীজী এখনো সেখানে।" কিংবা "লাহোর চল। ক্রন্দনের রোল এখনো উঠছে।" তেমনি পুবমুখো হতেও সাহস হয় না। পাছে শুনতে হয়, "নোয়াখালী চল। যা শুরু করে এসেছি তা শেষ করা চাই।"

তাই দক্ষিণ মুখে যাই। পুরীর সমুদ্রতীরে ডেরা বাঁধি। প্রতিদিন সমুদ্রের স্বাদ নিই। আমার কতকালের সমুদ্র। একই সমুদ্র এ দেশে আর ও দেশে।

সেই মধুরতম দিনগুলিতে আমরা আর কোনো কথা ভাবিনি। ভাবতে চাইনি। ভাবতে দিইনি খবরের কাগজ পড়িনি। রেডিওর খবর শুনিনি। লোকের সঙ্গে মিশিনি। আমরাই আমাদের সমাজ। চিঠিপত্র যারা লিখত তাদের বলা ছিল দেশের খবর যেন না দেয়। জানতুম সে খবর মালাকে আনমনা করে তুলবে।

আমাদের চারদিকে আমরা এক গজদন্তের মিনার গড়ি। সে মিনারে প্রেম আর শ্রম এই নামের এক যুগল বসতি করে। বাইরের জগৎ বাইরেই থাকে। ভিতরে প্রবেশ পায় না। সে তৃতীয় পক্ষ। মিনারে বসে আমি অনলসভাবে ছবি এঁকে যাই। মালা অনলসভাবে রাঁধে বাড়ে ধোয় মাজে ঝাড়ে মোছে সাজায় গোছায় কাচে। সময় পেলেই সেতার নিয়ে বাজায় আমি কথনো শুনি, কথনো শুনিনে। আমাকে যে তন্ময় থাকতে হয় হাতের কাজ নিয়ে। সেও একপ্রকার সঙ্গীত। তাকে শুনতে হয় চোখ দিয়ে আর

চোখ ভরে। মালার সেতার যেমন আমার জন্যে বাজে তেমনি আমার তুলিও মালার জন্যে রঙের খেলা খেলে।

দুঃখের দিনে একটা মাস যেন একটা বছর। কিন্তু সুখের দিনে একটা দিনের মতো ক্ষীণ। দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়; মাস শেষ হয়ে আসছে দেখে আমি কাতর হই। যেন কী একটা হারিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরে রাখতে পারছিনে। মালা কিন্তু একটুও কাতর নয়। ও জানে যে সুখ ওরই নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। ও যদি না যেতে দেয় তবে যাবে না। যতক্ষণ না যেতে দেয় ততক্ষণ থাকবে। ওর মধুমাস শুধু প্রথম মাসটাই নয়। পরের মাসগুলোও মধুমাস। একটা ফুরিয়ে গেলেও আর একটা তার জায়গা নেয়। পরম্পরার ছেদ নেই। একটা হারিয়ে গেলেও আর একটা মেলে। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। আমি অকারণে কাতর হচ্ছি। "নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই ফাগুন তখনো যাবে না।" মহাকবি বচন। আহা! তাই যেন হয়।

বাইরে মহাসিন্ধুর অশান্ত কলরোল। কান বধির করে দেয়। আমাদের গজদন্তের মিনারে বসে আমরা প্রণয়গুঞ্জনের নিরালা গাই। মধুমাস হয়তো কোনো দিন ফুরোবে না। কিন্তু এই ঝড়ঝাপটার যুগে জীবন নিঃশেষ হয়ে যেতে কতক্ষণ! যৌবন তো এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে এলো আমার। আমিও তাই ইচ্ছা করেই বধির হই বহির্জগতের অশান্ত কলরোলের প্রতি সে তার গর্জন নিয়ে থাকুক। আমিও আমার গুঞ্জন নিয়ে থাকি। আমি জানি যে আমি যেদিন নিঃশেষ হয়ে যাব সেদিনও এই ঝড়ঝাপটার যুগ বাইরে ফুঁসতে থাকবে। একবার পা টিপে টিপে পিছু হটবে, তার পর আবার বাবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মালাকে নিভৃতে কানে কানে বলি, "দুঃখ পেতে পেতে আমি সুখের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলুম। না দেখলে বিশ্বাস হতো না যে আমার অদৃষ্টে সুখ আছে। এখন আমি সুখের আস্বাদন পেয়েছি। কিন্তু আমার ভয় করছে। এত সুখ কি আমার কপালে সইবে!"

"ভয় কিসের! আমি তো থাকব বলেই এসেছি।" মালা আমার কানে কানে বলে। পাশাপাশি শুয়ে।

"কে জানে কোন্ দিন তুমি আবার রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড় দেখে উতলা হবে! বেরিয়ে পড়বে মরা রাজপুত্রদের বাঁচাতে। পাষাণের গায়ে মুক্তা ঝরার জল ছিটোতে। ভুলে যাবে যে যাকে রেখে যাচ্ছ সেও একটা পাষাণ। দুঃখ পেতে পেতে পাষাণ। তোমার কল্যাণে তার শাপমোচন হয়েছে। তোমার অভাবে আবার না পাষাণে পরিবর্তিত হয়।" আমি শঙ্কিত স্বরে বলি।

"না। আমি আর বেরিয়ে পড়ব না।" মালা আমাকে অভয় দেয়। "আমি দেখে এসেছি ও পথে আরো পথিক আছে। আরো পথিক থাকবে। তাদের কেউ না কেউ মায়াপাহাড়ে পৌঁছবে। মুক্তা ঝরার জল আনবে। একদিন না একদিন পাথরের ঘুম ভাঙাবে। হয়তো নিকট ভবিষ্যতে নয়। হয়তো আমাদের জীবনে নয়। কিন্তু আসবে সেদিন। আসবে।"

ও যেন বিশ্বাস ও আশা মূর্তিমতী। অবিচল। অটল। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি। আর মনে মনে ধন্যবাদ দিই। আপনাকে। আমার এ সৌভাগ্য দেবতাদের ঈর্ষা না জাগালে হয়।

"মালা", আমি ওকে নিশ্চিন্ত হয়ে বলি, "আমরা দু'জনে যদি দু'জনকে সুখী করতে পারি তা হলে এমন কিছু করলুম যাতে জগতে সুখের অনুপাত বেড়ে গেল। তার ফলে জগতে দুঃখের অনুপাত কমে গেল। এ যেন অমাবস্যার রাত্রে একটি রংমশাল জ্বালানো। সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যা হয়ে যায় দেয়ালী।

ক্ষণকালের জন্যে হলেও আঁধার আলো হয়ে যায়। আমাদের সুখ আর কারো সুখে বাদ সাধছে না। বরং আর সকলের অজ্ঞাতে আর সকলকে সুখী করছে। একটি পাথরকে প্রাণদানও প্রাণের সর্বতোবিস্তার।"

"আমি কিন্তু," মালা ভেবে বলে, "সুখী হলেই আরো বেশী করে অনুভব করি যে আমার মতো বহু মেয়ে অসুখী। তাদের অ—সুখ কি লেশমাত্র কমল!"

"কমল বইকি।" আমি নিশ্চয়তা দিই। "স্পষ্ট নয় যদিও। কমতেই হবে। না কমলে জগতের হিসাব মিলবে কেমন করে?"

মালা মৃদু হাসে। "আমি কি অঙ্ক কষতে বিয়ে করেছি? সুখী করতেই আমার আসা। সুখী না করে আমি যাচ্ছিনে। নিজে সুখী না হলেও তোমাকে সুখী করতে আমি যথাসাধ্য করব।"

"নিজে সুখী না হলেও?" আমি অভিমান করি। "কেন সুখী হবে না তুমি? আমি তা হলে কী করতে আছি?"

"তুমি?" মালা আমার হাতে হাত জড়িয়ে বলে, "তুমিও তোমার সাধ্যমতো করবে। তোমার চেষ্টা ব্যর্থ যাবে না। আমি সুখী হব। কিন্তু ওই যে বলেছি। আমি সুখী হলে তো নোয়াখালীর মেয়েদের পাঞ্জাবের মেয়েদের অ-সুখ লেশমাত্র কমল না। তাদের অ-সুখ আমার সুখকে লজ্জা দিতে থাকবে।"

আমি ব্যথা পাই। জগতে শয়তান আছে। তারা শয়তানি করবে। আমি তার কি করতে পারি। অভাগিনী মেয়েরা ভুগবে। আমি তার কী করতে পারি! মাঝখান থেকে মালা হবে অসুখী। আমার আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও অসুখী। হায়। এমন কোনো কৌশল আমার জানা নেই যা দিয়ে দুঃখিনীদের দুঃখ দূর করতে পারি। থাকলে আমি রাজা ক্যানিউটের মতো ঝড়ের সমুদ্রকে বলতুম, "সমুদ্র, তুমি হটে যাও।" অমনি সমুদ্র যেত হটে। ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে যারা ঘায়েল হয়েছে তারা আবার উঠে দাঁড়াত। গায়ের বালু ঝেড়ে ফেলত। জল মুছে ফেলত। যেন কিছুই হয়নি। হায়! সমুদ্র হটবে না। ক্যানিউটকেই হটতে হবে।

মালার একটি কথায় আমার একটু আপত্তি ছিল। মুখ ফুটে জানাই, "সাধ্যমতো সুখী করতে যে কোনো পুরুষ পারে। আমি করব সাধ্যের চেয়েও বেশী। আমি করব অসাধ্যসাধন। তাতে যদি তোমাকে সুখী করতে পারি।"

মালা আমার হাতখানি টেনে নিয়ে মুখে ছুঁইয়ে বলে, "আমি তা বিশ্বাস করি। তবু তোমাকে বারণ করব সাধ্যাতীতের সোনার হরিণ ধরে আনতে। সীতার উচিত ছিল রামকে নিবৃত্ত করা। তা না করে তিনি প্রবৃত্ত করেন।"

আমার বুকটা কেঁপে ওঠে। তৃতীয় জনকে আমি বড় ভয় করি।

মালা বলে যায়, "তুমি মহৎ শিল্পী হবে। এটা পুরুষোচিত উচ্চাভিলাষ। আমি তোমাকে বাধা তো দেবই না, বরং তোমার সহায় হব। কিন্তু স্ত্রীকে সুখে রাখার জন্যে যদি প্রাসাদ তৈরি করাই লক্ষ্য হয় তবে সেটা অনুচিত উচ্চাভিলাষ। দাসদাসী দিয়ে ভরিয়ে দেওয়াও তাই। এর জন্যে যদি তুমি চোখ ধাঁধানো তসবির আঁকো আর মুঠো মুঠো মোহর পাও তা হলে তুমি আমার সমর্থন হারাবে।"

মালাকে সুখী করার জন্যে এসবই আমি পারতুম। কিন্তু পারলে অসুখী হতুম। মালা আমাকে এর থেকে মুক্ত করে দিল।

কলকাতা ফিরে আসার পর আমাদের নিজেদের সংসার শুরু হলো। আমার মা রইলেন আমাদের

সঙ্গে। ভবানীপুরের বাসাটাতে একে জায়গা কম, তার উপর সেকেলে বন্দোবস্ত। মালার অসুবিধে হবারই কথা। তবু ও হাসিমুখে সহ্য করল। ওর মা ওকে বলেছিলেন তাঁর বাড়ীর এক অংশ ভাড়া নিয়ে নিজের ঘরকন্না পাততে। কিন্তু আমার মাকে সেখানে যেতে বলা যায় না। তিনি নারাজ হতেন। তাঁকে একা ফেলে রেখে আমাকে নিয়ে যেতে মালাও নারাজ।

প্রায়ই মাসিমা ও মেশোমশায়ের কাছে যাই। বলা উচিত শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও শ্বশুর মহাশয়। কিন্তু বলতে বাধে। এতক্ষণ যা বলে এসেছি তাই বলে যাচ্ছি। আর বেশী বাকীও নেই। মাসিমার মনে এখন নবীন উৎসাহ। আবার আগের মতো বুধবার বুধবার পার্টি দিচ্ছেন। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সমাজ-কল্যাণও করছেন। নতুন গবর্ণমেণ্টে তাঁর যথেষ্ট খাতির। সেই যে কবে অগাস্ট আন্দোলনের সময় ত্যাগস্বীকার করেছিলেন সেটা এতদিন পরে ডিভিডেণ্ড দিচ্ছে।

মেশোমশায় তেমনি চিন্তাকুল। মাসিমার মতে ওটা একটা রোগ। কেননা দেশ স্বাধীন হবার পর চিন্তার আর কী আছে? যেটা ছিল সেটা তো লক্ষাভাগ করে মিটিয়ে দেওয়া গেল। কেন তা হলে অনর্থক মন খারাপ করা? এই ভালো। ভাগ না দিয়ে ভোগ যখন করা যেত না তখন একভাবে না একভাবে ভাগ করতে হতোই। চাকরি ভাগ করতে হতো, দোকান ভাগ করতে হতো, কারখানা ভাগ করতে হতো, খামার ভাগ করতে হতো। তেমন ভাগাভাগির শেষ কোথায়? তার চেয়ে এই ভালো নয় কি? এর মধ্যে একটা চূড়ান্ততা আছে।

কলকাতাকে শান্ত করে গান্ধীজী নোয়াখালী রওনা হয়ে যাবেন এমন সময় ডাক পেলেন দিল্লী থেকে। সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় বিপন্ন। তাঁর মনে আশা ছিল তাঁর নিকটতম সহকর্মীরাই যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন তাঁদের ক্ষমতা তাঁর মিশনের সহায়ক হবে। তিনি দিল্লীতে সফলকাম হয়ে নোয়াখালীতে সাফল্যের জন্যে নৈতিক পাথেয় সংগ্রহ করবেন। কিন্তু মাসের পর মাস যায়। তাঁর মিশন অসমাপ্ত থাকে। তিনি দেখতে পান দেশ ভাগ হয়ে যাওয়াই চূড়ান্ত নয়। ভাগ হয়ে যাচ্ছে জনগণ। ভাগ হয়ে যাচ্ছে চাষী, কারিগর, মুদি, মজুর, ভিখারী। ভাগ হয়ে যাচ্ছে গরিব দুঃখী সর্বহারা। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে রাষ্ট্র কতবার খণ্ড খণ্ড হয়েছে। কিন্তু জনগণ বরাবরই অবিভাজ্য। তারা যদি স্বেচ্ছায় দু'ভাগ হয়ে যেত তিনি বাধা দিতেন না, আফসোস করতেন। কিন্তু তাদের ছলে বলে কৌশলে দু'ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। কয়েকটি মাথা করাচীতে বসে বোড়ের চাল দিচ্ছে। কয়েকটি মাথা দিল্লীতে বসে বোড়ের পালটা চাল দিচ্ছে। এই সর্বনেশে ভিসাস সার্কলের চূড়ান্ততা কোথায়? হতে পারে ওদের লক্ষ্য পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করে ভারতকেও মুসলিমশূন্য করা, ভারতকে হিন্দুস্থানে পরিণত করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পরাস্ত করা। কিন্তু এরাই বা খেলায় যেতে পরাস্ত হতে যায় কেন? পরকে লক্ষ্যভেদ করতে দেয় কেন?

"ওহে দেবপ্রিয়," মেসোমশায়ই আমাকে সর্বপ্রথম খবর দেন, "শুনেছ? গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেছেন! আমরণ অনশন!"

"হঠাৎ!" আমি আঁতকে উঠি। এই স্থবির বয়সে আমরণ অনশন!

"হাঁ। হঠাৎ।" মেসোমশায় উত্তেজিত হয়ে বলেন, "কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। পাকিস্তান খোলাখুলিভাবে ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতরাষ্ট্রও যদি ভিতরে ভিতরে তাই হয় তবে জিন্নানেতৃত্বেরই জয় হলো। গান্ধীনেতৃত্ব রইল কোথায়? গান্ধীজীর বেঁচে থেকেই বা কাজ কী? মানুষ বাঁচে তার কাজের জন্যে। তাঁর চোখের সামনে সর্বনাশ ঘটে যাচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ উৎপাটিত হতে চলেছে। স্বাধীনতা

কি তা হলে সর্বনাশ করার স্বাধীনতা? গান্ধীজী কি তা হলে দেশকে স্বাধীন করে দিয়ে আরব্য উপন্যাসের দৈত্যকে জালার ভিতর থেকে ছাড়া দিয়েছেন? এবার বুঝি সে তার মুক্তিদাতাকেই পেটে পুরবে?"

"ভালো লাগছে না।" মালা আমাকে প্রতিদিন বলে। "বাপুজী আগেও তো অনশন করেছেন। কই, এমন গা ছম ছম তো করেনি?"

না। এমন গায়ে কাঁটা দেয়নি আমারও। এবারকার অনুভবটা একেবারেই আলাদা। আগের বার দেশশুদ্ধ লোক চেয়েছে যে তিনি বাঁচুন। এবার বেশ কিছু লোকের মনের ইচ্ছা তিনি মরুন। তাঁকে করতে দেওয়া হবে না। মরতে দেওয়া হবে। হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে থাকতে পারবে না। ঘরের শত্রু বিভীষণকে তাড়াও। ভাই? হাঁ, বিভীষণও তো ভাই ছিল।

"তা মুসলমানদের এখন এ দেশে থাকার অধিকারটাই বা কিসের?" মাসিমা গম্ভীরভাবে বলেন। "দেশ ভাগাভাগির আগে যে অধিকার ছিল সে অধিকার কি আর আছে? আর ওখানকার হিন্দুরাই বা কেমন! কেন মরতে পড়ে আছে!"

এই মনোভাব থেকে আমার বন্ধুরাও মুক্ত নন। আমি নিজে মুক্ত, তার কারণ আমি বিহারের জন্য অনুতপ্ত। আমার সে সময় খেয়াল ছিল না যে ভূতের লড়াইতে আমিও পরোক্ষভাবে পক্ষ নিচ্ছি। আমি চাই ভূত ছাড়াতে। যে যার শ্যাওড়া গাছে বা গোরস্থানে ফিরে যাক। আমাদের বাঁচতে দিক।

মালা গান্ধীজীর জন্যে চিন্তিত থাকলেও নিজের কাজে অমনোযোগী হয়নি। ওকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমার কাজটিও তুচ্ছ নয়, যদিও বাপুজীর কাজের মতো মহৎ নয়। তোমাকে আমি কার হাতে দিয়ে যাব?"

"কেন?" আমি ওকে পরীক্ষা করার জন্যে বলি, "এতদিন আমি কার হাতে ছিলুম? আমি আত্মনির্ভর হতে শিখেছি।"

"ওমা! খেতে বসে কী খাচ্ছ তাই তোমার খেয়াল থাকে না। খেয়ে উঠে কী খেয়েছ তাও তোমার মনে পড়ে না। খেয়েছ কি খাওনি তাও তুমি ঠিক জানো না। স্টুডিওতে দিনমান এক পেয়ালা কফি আর খানকয়েক স্যাণ্ডউইচ খেয়েই কাটিয়ে দাও। আত্মনির্ভর হয়ে কী ছিরি হয়েছিল তোমার!" মালা শুনিয়ে দেয়।

বাস্তবিক। এই ক'সপ্তাহে আমার শরীরের আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। রংটাও মনে হচ্ছে এক পোঁচ ফরসা। এটা একটা অলৌকিক ঘটনা।

"বিয়ের পরে আমি পরিহাস করি," সব মেয়েই সমান। মায়াপাহাড় থেকে ফিরে কিরণমালাকেও বিয়ে থা করে স্বামীর জন্যে রাঁধতে হয়েছিল। স্বামীটিও তো সেই রাজপুত্র যে সাত সমুদ্র পেরিয়ে এসেছে, তেপান্তরের মাঠে ঘোড়া ছুটিয়েছে। কোথাও তো লেখে না যে তার সঙ্গে রাঁধুনী ছিল বা সে দু'বেলা খেতে পেয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর তারও পঞ্চাশ ব্যঞ্জন না হলে মুখে পলান্ন ওঠে না।"

মালার পরিহাসবোধ এমনিতেই একটু কম। ও আমাকে ভুল বোঝে। বলে, "তা হলে তুমি বিয়ে করতে গেলে কেন? তোমার ধরণ ধারণ যদি আগের মতোই থাকবে?"

সত্যিই তো। আমি বিয়ে করেছি বলে আমার সাবেক ধরণ ধারণ যে ছেড়ে দিয়েছি বা ছেড়ে দিতে চেয়েছি তা তো নয়। আমার আশঙ্কা আমি বিয়ের পর একটু একটু করে অলক্ষিতে পোষ মানা প্রাণী বনে যাব। যাকে বলে গৃহপালিত। সেটা আর কোনো মেয়ের হাতে না বনে মালার হাতে বনেছি

বলে এমন কী সান্ত্বনা। শিল্পীরাও খেতে ভালোবাসে, পরতে ভালোবাসে। কিন্তু তার জন্যে পোষ মানতে ভালোবাসে না। পোষ মানলে এমন কিছু হারায় যার ক্ষতিপূরণ নেই।

মনের ভিতরে আমারও এই অভিলাষটি ছিল যে বিয়ের পরেও আমি যেমনকে তেমন থাকব। সেলিবেট নয়, ব্যাচিলার। আমার জীবন যাপনের ধরন ধারনের উপর বৌ এসে মুরুব্বিয়ানা ফলাবে না। পদে পদে জবাবদিহি চাইবে না। রেঁধে খাইয়ে তৃপ্ত করে দাসখৎ লিখিয়ে নেবে না। আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খাবে না। অথচ মালা একদিন বাপের বাড়ী গেলে আমি চোখে অন্ধকার দেখি। যতক্ষণ না সে ফিরে আসে, ততক্ষণ আমার নিশ্চিন্ত হয়ে ছবি আঁকার জো নেই। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হলে যা হয়। বেশ বুঝতে পারি যে আমার সেই প্রচ্ছন্ন অভিলাষটি বিয়ের সঙ্গে বেখাপ। সেটিকে বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু তা হলে আবার প্রশ্ন ওঠে, শেষ পর্যন্ত আমি শিল্পী থাকব তো? না বিয়ের সঙ্গে বেখাপ বলে শিল্পীসত্তাটিরও বিজয়াদশমী অনিবার্য? যাক, মালাকে এসব বলিনে।

গান্ধীজীর অনশনে জিত হলো। যাদের হার হলো তারা কেন তাঁকে বাঁচতে দেবে? গয়ায় পিণ্ড না পাওয়া ভূতকে প্রমাণ করতে হবে যে তারই বয়স বেশী। সে-ই অধিকতর ভূত। মামদো তার কাছে সেদিনকার ছেলে। মামদো বড়জোর একজন গুণীজনের ঘাড় মটকাতে পারে, কিন্তু একজন মহামানবের বুকে বুলেট বসাতে তারও হাত কাঁপবে। ব্রহ্মদৈত্য না হলে কার এত বড় স্পর্ধা হবে?

সেই কালরাত্রি কি পোহাতে চায়! মালা মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে সারা রাত কাঁদে। আমি ওর গায়ে একখানা কম্বল জড়িয়ে দিতে যাই। ও সরিয়ে দেয়। ওকে সম্পূর্ণরূপে রিক্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কত অনুনয় করি। এক পেয়ালা দুধও খাবে না। অগত্যা আমারও অনশন। ওই এক পেয়ালা দুধ বাদ দিলে। মা ঠাকুর ঘরে ঢুকে রামধুন গান করতে থাকেন। তাঁরও সে রাত্রে লঙ্ঘন।

পরের দিন ও বাড়ীতে গিয়ে দেখি মাসিমা ও মেসোমশায় দু'জনেই সমান বিচলিত। মাসিমা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "শুনেছ দেবপ্রিয়, কাল রাত্রে অনেক হিন্দুর বাড়ী ভোজ দিয়েছে। কেউ কেউ নাকি আগে থেকেই তৈরী ছিল। জানত।"

কারো সর্ব্বনাশ, কারো পৌষমাস। আমি ক্রোধে জ্বলি। কিন্তু চোখের জল ধরে রাখতে পারিনে। সারা রাত বাঁধ দিয়ে রোধ করেছিলুম। বৃথা হলো।

মেসোমশায়েরও রাত্রে ঘুম হয়নি। চোখ দুটো ফোলা ফোলা লালচে। আমাকে পাশে বসিয়ে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "ইতিহাসে আমরা আগেও এ দৃশ্য দেখেছি। মানবপুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করছেন আর পুরোহিতদের ঘরে ঘরে ভোজ চলেছে। এমন কি জনতাও তাদের দলে ভিড়ে আনন্দ করছে। সেদিনকার পাপের ফল এখনো ভুগতে হচ্ছে তাদের বংশধরদের। দেখে দুঃখ হয়। সে রকম দুর্ভাগ্য যেন আমাদের বংশধরদের না হয়। আজকের দিনে এই আমাদের প্রার্থনীয়।"

আমরা সকলে মিলে প্রার্থনা করি। অবশ্য এই একমাত্র প্রার্থনীয় নয়। কাকে যেন উদ্দেশ করে মেসোমশায় বললেন, "জীবন তোমাকে যতদূর সাহায্য করা সম্ভব ততদূর করেছিল। আর পারছিল না। এবার মৃত্যু তোমাকে সাহায্য করবে। হাজার হাজার বছর ধরে সাহায্য করবে। এর সীমা নেই, শেষ নেই। তোমার কাজ একদিনও বন্ধ থাকবে না। এক মুহূর্তও না। তোমার কাজের মধ্যেই তুমি বেঁচে আছ। তুমি বেঁচে থাকবে। যে বাঁচায় সে-ই বাঁচে। আপন প্রাণের বিনিময়ে তুমি এ পারের

লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভাইকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলে। ও পারের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভাইকেও বাঁচিয়ে দিলে। আমাদের চিন্তায় ও কর্মে, ধ্যানে ও রূপায়ণে তুমি বাঁচবে। আর কারো সাধ্য নেই যে তোমাকে মারে। তোমার গতি রোধ করে। হে পথিক, তুমি অগ্রসর হয়ে আমাদেরও অগ্রসর করে দাও।"

মালার কান্না কি সহজে থামে! তবু প্রবলতম শোকেরও উপশম আছে। মালা একটু একটু করে শান্ত হলো। ও যেন বহুদিনের অসুখ থেকে সেরে উঠেছে। ওর গায়ে এতদিন হাত দিইনি। আদর করি ওকে।

তারই ফাঁকে সুধাই, "ওগো, তুমি কেন অতটা বিহ্বল হলে?"

"হব না?" ও বিস্মিত হয়ে বলে, "মায়াপাহাড়ের পথে যাদের রেখে এসেছি আর কি ওরা সে পথে এগিয়ে যেতে বল পাবে? একে একে ফিরে আসবে না?"

"তা হলে," আমি কৌতূহলী হই, "আবার স্বস্তি পেলে কী করে?"

"পেলুম এই কথা জেনে যে পথিকদের একজন মায়াপাহাড়ে পৌঁছে গেছেন। নিয়ে এসেছেন মুক্তা ঝরার জল। ছিটিয়ে দিয়েছেন পাথরের গায়ে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেছেন।" মালা বলে প্রত্যয়ের সঙ্গে।

আমি তার সরল বিশ্বাসে কৌতুক বোধ করি। বলি, "বাকী থাকে সোনার শুকপাখী। সেটি আনতে যাচ্ছে কে?"

"সেটি?" মালা আমার দিকে মধুরভাবে তাকায়। "সেটি আনতে যেতে হবে মায়াপাহাড়ে নয়। রূপলোকে। সেও এক মায়ার রাজ্য। সেখানে যাবে তুমি?"

"আমি! কী সর্বনাশ!" আমি চমকে উঠি। "সে কি সোজা রাস্তা! মালা! মালা! তুমি কি জানো না যে রূপলোকের মার্গও মায়াপাহাড়ের পথের মতোই বিপৎসঙ্কুল। ছায়ামূর্তিরা আমাকে ভয় দেখাবে। সোনার হরিণরা আমার লোভ জাগাবে। আমার প্রহরী হবে কে?"

"আমি হব তোমার বিনিদ্র প্রহরী।" মালা আমাকে কথা দেয়।

"তার পর," আমি আকুল কণ্ঠে বলি, "সংসারের ধান্দায় আমি ভুলে যেতে পারি কে আমি, কী আমার লক্ষ্য। ওগো, তুমি কি আমাকে মনে করিয়ে দেবে? তোমার নিজেরি মনে থাকবে তো?"

"নিশ্চয়।" মালা প্রতিশ্রুত হয়। "সংসারের ধান্দা থেকেও যতটা পারি বাঁচাব।"

"তার পর," আমি চিন্তান্বিত হয়ে বলি, "মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে আমার প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু অন্যায় যখন উদ্ধতভাবে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, নিরীহকে আঘাত করে, তখন আমি স্থির থাকতে পারিনে। ফলে বিপদ ডেকে আনি। দেখি, সে সময় তুমি কি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে?"

"তৎক্ষণাৎ।" মালা আমাকে ধন্য করে দেয়। "সৌন্দর্য আর আনন্দ আনতে যাচ্ছ বলে তুমি কি রাজপুত্র নও! রাজপুত্র হয়ে থাকলে রাক্ষসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধবেই। তুমি না চাইলেও আমিই তোমাকে দ্বন্দ্বে নামাব। আমি যে তোমার শক্তি।"

"অবশেষে," আমি মন খুলি, "আর একটি কথা। একার সাধনায় আমি রূপদক্ষ হতে পারি। কিন্তু রসবিদগ্ধ হব কী করে? তার জন্যে নিতে হয় নারীর কাছে দীক্ষা। তার জন্যে করতে হয় দু'জনে মিলে যোগসাধন। সখি, তুমি কি আমাকে রসের দীক্ষা দেবে?"

মালা মৌন থাকে। সম্মতির লক্ষণ দেখে আমি ওকে সোহাগ জানিয়ে বলি, "প্রিয়ে, তবে তাই হবে। আমি যাব আনতে সোনার শুকপাখী।"

শ্রীপঞ্চমী, ৭ই মাঘ ১৩৬৭ সমাপ্ত

নবীনচন্দ্র ঃ কবি ও মানুষ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী একদিন এই বলিয়া গৌরব ও আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেন যে, 'মধুসূদন বাংলার মিল্টন, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার স্যার ওয়াল্টার স্কট, নবীনচন্দ্র বাংলার বায়রণ, কালীপ্রসন্ন বাংলার কার্লাইল ও রবীন্দ্রনাথ (মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্র-প্রতিভা বিগত শতকেই বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে কিরণ-সম্পাত করিয়াছিল) বাংলার শেলি। অবশ্য, এই প্রসঙ্গে আমাদের একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার প্রতিভাকে বায়রণের প্রতিভার সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। বাংলা দেশের মনস্বী লেখক-কুলকে পাশ্চাত্য দেশের স্মরণীয় লেখকদের সহিত তুলনা করার মূলে যে মানসিকতা ছিল উহাকে অবশ্য সম্পূর্ণ সুস্থ বলা চলেনা—এই প্রবৃত্তি মূলতঃ প্রতীচ্য সাহিত্যেরই গৌরব-ঘোষণার প্রবৃত্তি। আর এই প্রবৃত্তির বশেই বাঙালী লেখকদের রচনার যেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য, সেখানে আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নাই। তবু একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, 'অবকাশরঞ্জিনী', 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'রঙ্গমতীর' কবি বায়রণ ও স্কটের ভাব-ধারার বহুলাংশে অনুপ্রাণিত হইলেও কাব্য-ত্রয়ীর কবি পশ্চিমের ভাবাদর্শের উপর যে নবীন মহাভারত রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন, উহার পরিকল্পনা কবির নিজস্ব। এই অভিনব পরিকল্পনার জন্য কবি মহর্ষি

ব্যাসদেবের নিকট কতখানি ঋণী এবং সমকালীন চিন্তাধারার দ্বারাই বা তিনি কতখানি প্রভাবিত হইয়াছেন,—তিনি যে ভাবে আখ্যান-বস্তু গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা কতটা ঐতিহাসিক ও কতটা অনৈতিহাসিক, এই সকল বিষয়ে আজও বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই। চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবী নবীনচন্দ্র কতখানি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার পরিকল্পিত কৃষ্ণচরিত্রের বীজ মূল মহাভারতে, বিশেষত ভগবদ্গীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে কতখানি নিহিত আছে, সে সম্পর্কেও কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নাই। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীর বিচারেও প্রায় সকল সমালোচকই একই কথার প্রতিধ্বনি (?) করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের চরিতকাব্যগুলিও (বিশেষতঃ 'অমিতাভ') কাব্যহিসাবে একেবারেই সার্থক হয় নাই, এমন কথাও বলা যায় না, অথচ কোন কোন সমালোচক ইহাদের মধ্যে কোন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই দেখিতে পান নাই। একজন খ্যাতনামা সমালোচক বলিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনী একালে প্রায় অপাঠ্য। এখানে 'প্রায়' কথাটি উল্লেখযোগ্য। যাহা হউক, নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল অতীত হইলেও তাঁহার রচনাবলীর (কাব্য গ্রন্থাবলী ও গদ্য গ্রন্থাবলী) যে বিশদ ও সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা হয় নাই, ইহাতে আমাদেরই চিন্তার দৈন্য সূচিত হয়।

কিন্তু আমরা নবীনচন্দ্রের রচনাবলীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা শুধু এই কথাটি বলিতে চাই যে, সমালোচনা বা সম্যক আলোচনা করিতে হইলে সম্যক্ দৃষ্টির প্রয়োজন। এই সম্যক দৃষ্টির অর্থ অন্ধ অনুরাগ বা বিরাগ নয়, এ দৃষ্টির অর্থ প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য রসতত্ত্ব, অলংকারশাস্ত্র বা তথাকথিত নন্দনতত্ত্বের প্রতি মোহ হইতে বিমুক্তি। আমরা আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে এই মোহমুক্তির পরিচয় পাইয়াছি।

নবীনচন্দ্রের মধ্যে উনিশ শতকের নানা ভাবাদর্শ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' রচিত হইবার পূর্ব্বে দুইজন কবির নিকট বাঙালী স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল,—রঙ্গলাল ও নবীনচন্দ্র। অবশ্য, কমলাকান্তের দুর্গোৎসবেই বঙ্কিমের ধ্যানমূর্ত্তি প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছিল। যাহা হউক, রঙ্গলাল বাঙালীজীবনের কাহিনী লইয়া কোন গাথা-কাব্য রচনা করেন নাই, নবীনচন্দ্রের মত বাঙালীকে বিদ্রূপের কশাঘাত করেন নাই (অবশ্য, এই বিদ্রূপ নবীনচন্দ্রের বাঙালীপ্রীতি হইতে উৎসারিত), আবার 'সমরসংগীত' রচনায়ও রঙ্গলাল তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। এক হিসাবে নবীনচন্দ্রের 'বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সমর-সংগীত। পলাশির যুদ্ধ' সেকালে সারা বাংলার পাঠক-সমাজের নিকট যে বিপুল অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল, তাহা আজ যেন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। 'পলাশির যুদ্ধে' নবীনচন্দ্র সিরাজের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য সেকালের এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন, আবার আর একজন প্রসিদ্ধতর ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, দুর্দ্দণ্ড ও নানা দোষে কলঙ্কিত সিরাজের পতনে নবীনচন্দ্র মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতিও আমাদের সহানুভূতি জাগাইয়া তুলিয়াছেন। (অধ্যাপক সুবোধ চন্দ্র রায় সম্পাদিত 'পলাশির যুদ্ধের' ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কোন সমালোচক আবার 'পলাশির যুদ্ধে' নবীনচন্দ্রের ইংরেজ-প্রীতির নিদর্শন দেখিতে পাইয়াছেন কিন্তু মনে রাখা উচিত, এখানে নবীনচন্দ্র সে যুগের ভাবনারই প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। এই ভাবনা নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ঈশ্বর গুপ্তের যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতায়, কিন্তু রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, এমনকি, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়ও ইংরেজ-প্রীতির নিদর্শন আছে, তথাপি ইঁহাদের সকলের ন্যায় নবীনচন্দ্রও আমাদের স্মরণীয় ও বরণীয়। প্রতিভাশালী হইলেও ইঁহারা যে যুগের প্রতিনিধি, সেকথা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

যাহা হউক, সেকালের বাঙ্গালী শুধু 'পলাশীর যুদ্ধের' কবির কাছে নয়, 'রঙ্গমতী' নামক আখ্যানকাব্য ও 'শবসাধন' নামক খণ্ড কবিতার কবির কাছেও স্বদেশ-প্রেমের দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র যৌবনে ছিলেন নব্য তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রচারক, কিন্তু প্রৌঢ় কবি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ও বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জীবনের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা অবলম্বনে কাব্যত্রয়ী-রচনার যে দুঃসাধ্য প্রয়াস নবীনচন্দ্র করিয়াছেন, বাঙালী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব অসামান্য। বাংলার বিপ্লবীদের উপরও যে এই কাব্যত্রয়ীর প্রভাব বড় কম ছিল না, সে কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। এই কাব্যত্রয়ীতে শ্রীকৃষ্ণ জাতীয়তা ও মানবতার আদর্শের সমন্বয়-মূর্ত্তি, দ্বাপরের শেষভাগে যখন যাগ-যজ্ঞই মানুষের নিকট যথার্থ ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিল, আর্য্য ও অনার্য্যের বিরোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, ভারত যখন বহু খণ্ড ও ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ মানবধর্ম্ম ও প্রেমধর্ম্মের উপর অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাই কাব্যত্রয়ীর প্রতিপাদ্য। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রচিত মহাভারতে নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু কাব্যের আখ্যানবস্তু অনেকাংশে নবীনচন্দ্রের স্বকপোল-কল্পিত। নবীনচন্দ্র প্রধানত মহাভারত-অবলম্বনে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত নাম-সংকীর্ত্তন ও প্রেমধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আবার 'প্রভাস' কাব্যের (তথা 'অমিতাভ' কাব্যের) উপসংহারে তিনি পৃথিবীর নানা দেশ ও নানা জাতির ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উনিশ শতকের নানা বিচ্ছিন্ন ভাবধারা নবীনচন্দ্রের মধ্যে সমন্বিত হইবার প্রয়াস পাইতেছে। 'পলাশির যুদ্ধে' নবীনচন্দ্র যদি জাতি-বৈরের কবি হন, তবে কাব্যত্রয়ীতে তিনি অখণ্ড মানবতাবাদের কবি। কাব্যত্রয়ীর নানা দোষত্রুটি সম্পর্কে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু নবীনচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও অসামান্যতা সম্পর্কে অনেকেই নীরব রহিয়াছেন। কাব্যত্রয়ীর এমন বহু সর্গ আছে যাহা যুগপৎ মহাকাব্যোচিত ও নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ। (যেমন 'প্রভাস' কাব্যে দুর্ব্বাসার বিশ্বরূপদর্শন।) সুতরাং নবীনচন্দ্রের প্রতিভা মহাকাব্য-রচনার উপযোগিনী ছিল না, এ কথা সত্য নয়; দুর্দমনীয় হৃদয়াবেগের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই কবি সর্ব্বত্র সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহাই সত্য।

বাংলার কাব্য-সাহিত্যের ন্যায় গদ্য-সাহিত্যেও নবীনচন্দ্রের দান নিঃসন্দেহে স্মরণীয়, কিন্তু গদ্য লেখক হিসাবে নবীনচন্দ্র আজও আমাদের দেশে উপেক্ষিত। তাঁহার 'প্রবাসের পত্রের' ছত্রে ছত্রে পাই ভক্ত-কবির স্বতঃস্ফূর্ত্ত হৃদয়াবেগের পরিচয়। তাঁহার 'আমার জীবন' নানা তথ্যে সমৃদ্ধ, সম-সাময়িক বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের নানা উপকরণ এই বিপুল গ্রন্থখানির স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত, যে সকল মনস্বী বাঙালীর সান্নিধ্য কবি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিবরণও অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থখানি এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল, সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ তিন খণ্ডে গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়া সাহিত্যরসিক পাঠকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। যাঁহাদের নিকট 'আমার জীবনের' লেখকের 'অহমিকা' অশোভন বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, নবীনচন্দ্র মানুষটি কোথাও নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া কথা বলিতে জানিতেন না, প্রচ্ছন্ন অহমিকাকে বিনয় বা সৌজন্যের আবরণে আবৃত করিবার কৌশলটিও তিনি আয়ত্ত করেন নাই। সুতরাং তথাকথিত কুশলী লেখকের পক্ষে ভাষা যেখানে প্রয়োজনমত 'the art of concealing thoughts', নবীনচন্দ্রের পক্ষে ভাষা সেখানে সর্ব্বদাই 'the art of expressing thoughts'.

যাহা হউক নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবনের' ন্যায় নানাতথ্য-সমৃদ্ধ ও কৌতূহলপ্রদ আরো একখানি আত্মচরিত বাংলায় রচিত হইয়াছে কিনা জানিনা।

উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র ছিলেন আদর্শবাদী। অবশ্য, আমরা শুধু 'ভানুমতী' নয়, 'রঙ্গমতী'কেও উপন্যাস মধ্যে গণনা করি। এখানে একটি কথার উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা নবীনচন্দ্রের কাব্যে কিছুপরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে, এ বিষয়ে তিনি হেমচন্দ্রের মত ব্যর্থ হন নাই। সকলেই জানেন, হেমচন্দ্র সংস্কৃতের অনুসরণে যে তথা-কথিত অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা 'মিলহীন পয়ার' মাত্র।

নবীনচন্দ্রই একমাত্র কবি যিনি কাব্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মান্দোলনের দুইটি ধারা নবীনচন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন। একটির নায়ক কেশবচন্দ্র। তিনি শুধু 'নব-বিধানের' আদর্শই প্রচার করেন নাই, তিনি তাঁহার কয়েকজন অনুগামীকে বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, মৌলানা গিরিশচন্দ্র সেন, রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের উপর যথাক্রমে হিন্দুধর্ম্ম, ইসলাম ধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ভার অর্পিত হইয়াছিল। একমাত্র প্রতাপ মজুমদার ভিন্ন আর সকলের দানেই বাংলা সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইঁহাদের দানের কথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজও স্বীকৃতি লাভ করে নাই।

উনিশ শতাব্দীর ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব আর একটি অসাধারণ ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের নূতন করিয়া এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম উপলব্ধির বস্তু, পাঠ বা বিচারের বস্তু নয়। তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া, নানা ধর্ম্মমতে সাধনা করিয়া এই সত্য প্রচার করিয়াছিলেন যে 'যত মত, তত পথ'। কেশবচন্দ্রের আদর্শ ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনালব্ধ সত্যের দ্বারা নবীনচন্দ্র বিশেষভাবেই প্রভাবিত হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের দান হিন্দুধর্ম্মের নব-অভ্যুত্থানে সামান্য নহে, একথা সকলেই জানেন, কাব্যত্রয়ী ও চরিতকাব্য রচনা ভিন্নও তিনি যে পদ্যে ভগবদ্গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ করিয়াছেন, এ কথাও সকলেরই জানা আছে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, সে কথা অনেকে জানেন না। তাই নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

'সকল ধর্ম্মের মূলের অভিন্নতা প্রতিপাদন করাই আমার অবতার লীলা লিখিবার উদ্দেশ্য।

একদিন আলিপুর কোর্টে ফৌজদারি মোকদ্দমায় নিবিষ্ট আছি, এমন সময় ডাকে একখানি পত্র পাইলাম। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে, তিনি একজন নিতান্ত ঘৃণিত চরিত্রের ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরণছায়া পাইয়া তিনি উদ্ধারলাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমার 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'অমিতাভ' তিনি তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। 'অমিতাভ' পাঠ শেষ করিয়াই পত্র লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমি বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখের কথা প্রতিপালন করিবার জন্য আবার কবে আসিবেন—'পূর্ণ কাল, পূর্ণ ব্রহ্ম আসিবে কখন'? কিন্তু তিনি যে আসিয়াছিলেন, তাহা কি আমি টের পাই নাই? তিনি ত্রেতার 'রাম' নাম এবং দ্বাপরের 'কৃষ্ণ' নাম একত্র করিয়া 'রামকৃষ্ণ' নামে আবার আসিয়াছিলেন। অতএব আমাকে এই 'রামকৃষ্ণের' লীলাও লিখিতে হইবে। এই কয়টি কথায় আমার প্রাণ স্পর্শ করিল। তাঁহার পত্রের ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বহুপূর্ব্ব হইতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আমি একজন অযোগ্য ভক্ত ছিলাম। কিন্তু তাঁহার নাম ইতিপূর্ব্বে এমন আমার প্রাণে লাগে নাই'।

নবীনচন্দ্রের এই উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি, প্রতীচ্য শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেও নবীনচন্দ্র ছিলেন অন্তরে অন্তরে বাঙালী, তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিও তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছিলেন।

গাধা

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

সেদিন বিকেলে জগুবাবুর বাজারের কাছে কোনরকমে ভীড় ঠেলে ফুটপাথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা লোক একেবারে বুলেটের মতো ছিটকে এসে পড়ল ঘাড়ের ওপর। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। মেজাজটা বিগড়ে গেল ভয়ানক। লোকটা হড়কে পালাবার আগেই তার হাতটা চেপে ধরলাম। দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলাম—কি মশাই, কানা নাকি? দেখে রাস্তা হাঁটেন না?

বলে তার মুখের দিকে ভাল করে তাকাতেই দেখি—আরে এযে, আমাদের নীলু, নীলকান্ত বক্সী!

বললুম—তুই আচ্ছা লোকতো নীলে! এইভাবে রাস্তা চলেছিস, মানুষ খুন করবি নাকি?

নীলু আমার কথার জবাব না দিয়েই বললে—খবর শুনেছ সন্তুদা? ফটকে বে' করেছে?

বললুম—যাঃ, ভাঁওতা মারবার আর জায়গা পাসনি।

নীলু বললে—মাইরি, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি সন্তুদা। এই মাত্তর আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম ফটকের ঘরে একটা জলজ্যান্ত বৌ বসে আছে। এ দেখার পর কি কারুর মাথার ঠিক থাকে? তুমিই বল।

কথাটি ভাবনার কথা বটে। অন্ততঃ আমার কাছে যতটা না হোক নীলুর কাছে তো বটেই। জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় বে' হল র‍্যা? কিছু খবর জানিস নাকি?

নীলু খালি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—জানিনে আবার। জানি সবই। দুনিয়ায় সব ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর। খালি আমার বেলায়, যতো সব—

তারপর হাতের জলন্ত সিগারেটটায় গোটা দুই টান মেরে সেটাকে মাটীতে আছড়ে ফেলে বলে উঠল—শ্শালাঃ।

বললুম—নীলে, তোর যদি খুব কাজ না থাকে তো চল না পায়চারি করতে করতে ময়দানে ঘুরে আসি। ফটকের বৌয়ের কথা কি জানিস বল শুনি।

নীলে বললে—ময়দানে যাও তো চল। আমি তো ফটকের বাড়ী মুখো আর হচ্ছিনে, কাজেই এখন আমার করবার কিছু নেই। তবলা জোড়াটা এক ফাঁকে নিয়ে এলেই চলবে এখন। তবে এখন আমি কিছু বলতে পারব না, রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলছে।

বললুম--ময়দানের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে ওসব ঠিক হয়ে যাবে'খন। চল ময়দানে যাবার আগে কোয়ালিটিতে বসে একটু আইসক্রীম খেয়ে যাই।

কোয়ালিটির নামে নীলু একটু ঠাণ্ডা হল। বললে—আচ্ছা চল।

ময়দানে গিয়ে বসার আগে পর্যন্ত কিন্তু নীলু কোন কথাই বললে না। গুম্ মেরে রইল সর্বক্ষণ। কাজেই আমি মনে মনে কেবল ফটিক চাঁদের কথাই ভাবতে রইলুম।

ফটিকচাঁদ গাইয়ে বাজিয়ে লোক। বরাবরই তার গান গাইবার গলা ভাল আর গাইতও ভাল। ইদানীং সে নিজেই গান লেখে, সুর দেয়, নিজেই গেয়ে কলকাতার আসর মাৎ করে। আমি ছেলেবেলা থেকেই ফটিকচাঁদকে বেশ খানিকটা ঈর্ষার চোখে দেখতাম। ফটিকচাঁদের বাবা যখন প্রথম আমাদের গ্রামে ষ্টেশন মাষ্টার হয়ে এসেছিলেন তখন আমরা সবে মাইনর পরীক্ষা দিয়ে বড় ইস্কুলে ঢুকেছি।

শুনলুম তিনি নাকি কোন এক সহরের ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। সেখান থেকে সহরে চালচাল নিয়ে এসেছেন। একদিন মেজ জ্যাঠামশাই-এর সঙ্গে ফটিক-এর বাবা এলেন আমাদের বাড়ীতে। সঙ্গে ফ-কচাঁদ। ফটিকচাঁদের বাবা খুব জাঁক করে বললেন—আমার ছেলেকে লেখাপড়া, গানবাজনা, সব কিছুই শেখাচ্ছি।

মেজ জ্যাঠামশাই প্রাচীন পন্থী গোঁড়া লোক। চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেকে গান শেখাচ্ছেন কী মশাই! তুড়ি দিয়ে টপ্পা গাইবে সবার সামনে সেটা কী ভাল?

ষ্টেশনমাষ্টার একটু কৃপার হাসি হেসে বললেন—ওসব দিন চলে গেছে কৃপানাথ বাবু। আজকাল ছেলেমেয়েদের গানবাজনা শেখান সহরের রেওয়াজ হয়ে গেছে। তা ছাড়া ফটিক আমার সুন্দর গান গাইতে পারে, শুনবেন? মেজ জ্যাঠামশাই 'না' বলার আগেই ষ্টেশনমাষ্টার বাবু আমাদের চাকরকে হুকুম করলেন তাঁর বাড়ী থেকে হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসতে। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম আমাদের বয়সী ফটিকচাঁদ গম্ভীরভাবে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে লাগল আমাদের বারান্দায় বসে। প্রথমে সে আমাদের দিকে একবার কৃপা কটাক্ষ করে নিয়ে হারমোনিয়ামটা অবলীলায় বাজিয়ে গেল। তারপর গাইতে লাগল—

কতো দিন, আর কতো দিন বহিব
বিরহের ভার কতদিন।
আশা নিরাশায় দিন কেটে যায়
ঘাটে নাহি আসে তরণী,
কতদিন—।

ফটিকচাঁদের কৃতিত্বে আমাদের বাড়ীর মা-কাকীমারা, ছোট কাকা, ন'কাকা সবাই মুগ্ধ। শুধু রাশভারী মেজ জ্যাঠাইমা মাকে ডেকে গম্ভীর মুখে বললেন—সেজবৌ, সন্তুকে খবরদার ঐ টেরীকাটা ছোঁড়াটার সঙ্গে মিশতে দিসনি। ও ছোঁড়ার বাপ মিন্‌সে কী বলে ছেলেকে ঐ সব গান শেখাচ্ছে! উচ্ছন্নে যেতে তো আর দেরী নেই দেখছি।

মেজ জ্যাঠাইমার কথা ফেলে মায়ের এমন সাধ্যি ছিল না। কাজেই ফটিকচাঁদের সঙ্গে মেলামেশা আমার বন্ধ হল। কিন্তু তাহলে কী হয়, পরের মাসে দেখলাম ফটিকচাঁদ ভর্তি হয়েছে আমাদের ক্লাশে। স্কুলে তার সঙ্গে আমার খুব ভাব জমে গেল। ভাবটা আমিই করলাম। তাকে অনেক পেয়ারা আর নারকেল কুল ঘুষ দিয়ে।

গাইয়ে হিসাবে ফটিকচাঁদের খ্যাতি সারা স্কুলে ছড়াতে দেরী হল না। স্কুলের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন-এর সময় ফটিকচাঁদ উদ্বোধন সঙ্গীত গাইল—গাও পাখী গাও অমিয় বুলাও।

মাষ্টারদের মহলে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল। তারপর থেকে বছরের পর বছর ফটিকচাঁদের পাশের নৌকো বানচাল হতে হতেও সে ক্লাশে উঠতে লাগল ঐ গানের জোরে। প্রতি বছরেই তার উদ্বোধন সঙ্গীতের গাইয়ের আসন পাকা হয়ে রইল প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের সময়।

মেজ জ্যাঠাইমা কিন্তু ভারী দূরদর্শী মহিলা ছিলেন। তাই তাঁর কথা ফলতে দেরী হল না। আমরা তখন থার্ড ক্লাশে পড়ি। শোনা গেল বুকিং ক্লার্ক বাবুর বড় মেয়েটি বয়সে ফটিকচাঁদের থেকে বেশ বড় হলেও সে নাকি ফটিকের গানের বড় ভক্ত হয়ে উঠেছে। তাই রাত প্রায় দশটা অবধি সে ফটিকের বাড়ীতে কাটায়।

একদিন ফটীক বললে—সন্তু তোর সঙ্গে কথা আছে।

বললুম—কী বল।

ফটিকচাঁদ বললে—কাউকে বলবি না কিন্তু। আমি প্রেমে পড়েছি :

আমিতো অবাক। লোকে বই পড়ে, এখানে সেখানে পড়ে, গাছ থেকে পড়ে, এমন কী খানায় পর্যন্ত পড়ে জানি। প্রেমে পড়াটা কী ব্যাপার তা জানতুম না।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—সে কি রে ?

ফটিক বললে—তুই হদ্দ পাড়াগেঁয়ে। প্রেমে পড়া জানিস না। মেয়েছেলে আর ব্যাটাছেলেতে ভাব হওয়া।

কথা শুনে তো আমার চোখ কপালে উঠে গেছে। শুকনো গলায় বললাম—তোর বৌ কে ?

ফটিক বললে—ঘুন্টি। বৌ এখনও হয়নি, তবে আমি তাকে ছাড়া আর কাউকেই বে করব না। এই ত্যাখ না সে আমায় কী লিখেছে।

বলে ফটিক নীল রং-এর খাম বার করলে পকেট থেকে। তাতে গোটা গোটা হরফে লেখা আছে—প্রাণেশ্বর ফটিক, মুখে বলিতে পারি নাই বড্ড লজ্জা করেছিল। আমি তোমারই। তোমারই ঘুন্টি।

সর্বনাশ! আমি চিঠিখানা পড়ে চার দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। ভয়ে আমার আপাদমস্তক শুকিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে মেজ জ্যাঠাইমা কাছে পিঠে কোথাও যেন লুকিয়ে সব দেখছেন।

এরপর ফটিক আমাকে দত্তদের বাগানে টেনে নিয়ে গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে টানতে লাগল। আমায় বললে—খানা একটা। আরে এ সব না খেলে বড় হয় না।

আমি ফটিকের ধরান সিগারেটটায় একটা টান মেরে এমন জোরে কেশে উঠলুম যে দম আটকাবার জোগাড়।

ফটিক মতব্বরি চালে সিগারেট টানতে টানতে বললে—নাঃ তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। না পারিস প্রেম করতে না পারিস সিগারেট টানতে।

এরই প্রায় মাস খানেকের মধ্যে শুনলুম ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর আর বুকিং ক্লার্ক বাবুর দুই পরিবারে ভীষণ ঝগড়া বেধেছে। উপলক্ষ্য একদিকে ঘুন্টি অন্যদিকে ফটিক। শুধু তাই নয় ষ্টেশনমাষ্টার বাবু ফটিককে একদিন এমন মার মেরেছেন যে প্রায় এক সপ্তাহ তার স্কুল কামাই, ওদিকে ঘুন্টিও তার মায়ের মারের চোটে কি কি সব কথা জানিয়েছে। সেই সব কথা শুনে ফটিকচাঁদের বাবা বলেছেন ফটিককে জ্যান্ত কেটে ফেলবেন। আমার সঙ্গে একদিন আড়ালে দেখা হতেই ফটিকচাঁদ বললে—দেখলি ঘুন্টিটার বিশ্বাসঘাতকতা। মারের ভয়ে সব বলে দিয়েছে ওর মাকে। আর মিথ্যে মিথ্যে করে কতো কী লাগিয়েছে আমার নামে। অথচ ওই আমাকে শিখিয়েছে। মেয়েদের জাতকে কক্ষণো বিশ্বাস করিস নে সন্তু।

এসব অবশ্য অনেককাল আগের কথা। তারপর আমরা রীতিমতো বড়ো হয়েছি। কিন্তু ফটিকের নারী-বিদ্বেষ এতটুকু কমেনি। আমরা কলকাতায় এসেছি পড়াশুনো করতে। ফটিক দু'একবার ফেল করে কলেজ ছেড়ে দিল। সে গান বাজনার চর্চা করতে লাগল উঠে পড়ে। বাড়িতে রীতিমতো গলা ভাঁজে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক সবই সে গায়। মাঝখানে একটা গান রেকর্ড করে একদিন সে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল। এমন এক গান লিখল সে আর তাতে এমন সুর দিল যে তা শুনে সারা বাংলার তরুণরা প্রায় মূর্ছা যাবার যোগাড় হল। ফটিকের এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নে নীলকান্ত বললে—কী গানই বেঁধেছ ফটিক মামা। আর তা কী দরদ দিয়েই যে গেয়েছে।

কিছুদিনের মধ্যে তরুণদের মুখে মুখে সেই গান ফিরতে লাগল। রাস্তায়, ট্রামে বাসে কেবল শোনা যেতে লাগল ফটীকের বাঁধা গান—

বসন্তে পাপিয়া বলে গেল
চলে গেল দিন চলে গেল
তবুও তো প্রিয়া নাহি এল।
জীবনের সুখ চলে গেল
বিরহেতে বুক জ্বলে গেল
ইত্যাদি ইত্যাদি

নীলকান্ত এতদিন ফটীককে পুঁছত না। সে পাড়ার ছেলেদের ভিতরে মস্তানী করে বেড়াত। ফটিক যেই বিখ্যাত হল অমনি নীলু ফটিকের বাড়ী গিয়ে পুরোণ সম্পর্ক ঝালিয়ে তাকে একদিন তাদের পাড়ার বিজয়া সম্মিলনীতে নিয়ে এল। আর তারপর থেকেই সে তার মামার চেলা হয়ে গেল। এক জোড়া বাঁয়া তবলা কিনে সে ফটীকের গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে লাগল। গানের টুইশনি করে আর আধুনিক গান গেয়ে ফটীক বেশ ভাল রোজগার করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে নীলুও। টুইশনিতে অবশ্য ফটীকের ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশী হল। কিন্তু তবুও তার সেই ভিতরকার নারী বিদ্বেষ কিছুতেই গেল না।

একদিন আমার সঙ্গে দেখা। বললুম—কিরে ফটিক বে'থা করবি না?

ফটিক বললে—রামচন্দ্র। বে করে গাধারা! মানুষে কখনো বে' করে না।

বললাম—বলিস কি রে! চিরকাল হাত পুড়িয়ে খেয়ে বাঁচবি কেমন করে? তোর মা কতো দুঃখ করলেন সেদিন।

ফটিক বললে—মার কথা ছেড়ে দে। টাকা ফেললে রাঁধুনী বামুনের অভাব?

বললাম—কিন্তু রোগে সেবা?

ফটিক বললে—পয়সা ফেললে ভাড়া করা নার্স তোমার বে করা পরিবারের চেয়ে আরাম দেবে বেশী।

বললাম—তা না হয় হল, কিন্তু বয়স তো হয়েছে। একজন সঙ্গিনীর দরকার অস্বীকার করবি কেমন করে?

ফটীক আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু কৃপার হাসি হাসল। বললে—তুই চিরকালই পাড়াগাঁয়ে থেকে গেলি সন্তু। আমার ছাত্রীদের মধ্যে অন্ততঃ পনেরো জন মেয়ে আমাকে পেলে জীবন ধন্য মনে করে। বিয়ের দরকারটা কি!

বললাম—মেয়েদের সঙ্গে ভাব করবি অথচ বিয়ে করার বেলা আপত্তি।

ফটীক বললে—ঠিক তাই। ওদের সঙ্গে ভাব করা যায় কিন্তু বিয়ে যারা করে তারা গাধা। কারণ কোন মেয়েকে বিশ্বাস করতে নেই।

কিছুদিন পরে নীলকান্ত আমার কাছে এসে কাঁদোকাঁদো গলায় বললে—আচ্ছা একি কাণ্ড দেখতো সন্তুদা। বোসেদের মিনির সঙ্গে আমার কতোদিনের আলাপ। অনেক করে বিয়ের ব্যাপারটা পাকা করে নিয়ে এলাম। বিয়ে হলেই মিনির বাপের পেট্রল পাম্পটা আমার হাতে আসবে। সব

ঠিকঠাক। মামা তাতে বাগড়া দিয়ে দিলে। বললে—খবরদার বিয়ে যদি করিস তো আমার ত্রিসীমানা মাড়াসনে। গান বাজনায় সিদ্ধিলাভ অত সোজা কাজ নয় যে পেট্রলের ডিপোর খবরদারি করতে করতে তা করা যাবে। তা ছাড়া বিয়ে করা লোকগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আচ্ছা তুমি আমায় একটু হেল্‌প করতে পার? মামাকে—বুঝিয়ে সুজিয়ে—

বললাম—তোমার মামা বিয়ের ওপর যেমন চটা, তাতে আমার সাধ্যি নেই যে তার মত বদলাব।

সেই কথাগুলো মনে পড়তেই নীলুকে বললাম—আর কেউ বিয়ে করেছে একথা বললে বুঝতাম, কিন্তু ফটীক!

নীলু একটু অন্যমনস্কভাবে বললে—হ্যাঁ গো সন্তুদা। ওকে যা মনে করতে তা ও আদবেই নয়।

কোয়ালিটির আইসক্রীম খেয়ে, একটা গোল্ড-ফ্লেক সিগারেট ধরিয়ে, ময়দানের ঠাণ্ডা হাওয়াতে নীলুর মাথাটা অনেক ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল।

বললে—তুমি তো জান, কবার মামার ঘরেতে কী রকম চুরি হতে আরম্ভ করল। আমি বললুম—মামা, সব ফেলে বেরিয়ে যাও ঐ রাঁধুনী বামুনের ওপর ছেড়ে দিয়ে এটা ভাল নয়।

গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়। একবার একটা মেদিনীপুরের ছোকরা চাকর প্রায় পাঁচ হাজার টাকায় ঘা দিলে! তারপরের বারে একটা উড়িষ্যাবাসী প্রায় হাজার সাতেক টাকা গাপ করল। বললাম—মামা এবার একটা বিয়ে কর।

তা বলে কী—কভি নেহি। তুই যদি আমায় কোনদিন বে করতে দেখিস তো সেদিন আমায় গাধা নামে ডাকিস।

আমি বললাম—ফটিক আমার কাছেই এসেছিল মাস কয়েক আগে একটা বিশ্বাসী চাকরের খোঁজে ও আমিও তাকে বিয়ে করবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম একটি মেয়ে পুলিশ বে' করতে। ওতে দুটো কাজই হত। বৌকে বৌ, পুলিশকে পুলিস, চোর তাড়াতে পারত।

নীলু বললে—তা মেয়ে পুলিশ বে' করেনি ফটুকে তবে দারোগার মেয়ে এনেছে।

অবাক হয়ে বললুম—বলিস কী! একেবারে দারোগার মেয়ে।

নীলু বললে—হ্যাঁ, বিষ্টপুরের কেষ্ট দারোগার মেয়ে!

জিজ্ঞাসা করলাম—শেষ পর্যন্ত কী প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল?

নীলু বললে—আরে ছোঃ।

বলে নিজের বুকটা চিতিয়ে কয়েকটা টোকা মেরে দেখাল।

বললাম—তা হলে?

নীলু বললে—তাহলে আর কী? গত সরস্বতী পুজোয় বায়না নিয়ে ফটকে আর আমি গেলুম বিষ্টুপুরে। অনেক রাত হয়ে গেল গানবাজনা শেষ হতে। তারপর খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হল কেষ্ট দারোগার বাড়ী। শুনলুম কেষ্ট দারোগার একটা মেয়ে আছে। সে মেয়ে নাকি লাঠি খেলা, ছোরা খেলা শুধু নয় কুস্তিতে পর্যন্ত একটা পালোয়ানকে হারিয়ে দিয়েছে। বাড়ীতে একটি বিপর্যয় ষাঁড় আছে তার কাছে ষণ্ডা চাকরগুলো পর্যন্ত ভয়ে কাঁপে। তা সে মেয়ে নাকি তার নাকে দড়ি দিয়ে চরিয়ে আনে। আরও শুনলাম সে মেয়ে নাকি আবার মস্ত গানের ভক্ত। আমরা যেতেই সেই বেহায়া মেয়েটা তো ফটকের পিছনে

একেবারে যাকে বলে কাঁঠালের আঠার মতো লেগে রইল। খাওয়াটা অবিশ্যি জোর হয়েছেল। রাতের বেলা পেটে বেদম চাপ। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে একটা গাড়ু হাতিয়ে বাড়ীর পিছন দিকে গাড়ুকম্মে যাব, দেখি ওমা আমার ফটিক মাতুল আর কেষ্ট দারোগার সেই থুবড়ী আইবুড়ী মেয়ে দুজনে বারান্দার পাশে একেবারে হরগৌরী হয়ে গেছেন দুনিয়া ভুলে। আমি গাড়ুকম্ম মাথায় রেখে এসে ঘাপটী মেরে শুয়ে রইলুম। যেন কিচ্ছুটি জানিনে।

কলকাতায় ফিরে এসে দেখি ফটকের ঘরবাড়ী সব হাঁ হাঁ করছে। একটা নতুন বেহারী চাকর রেখেছিল ইদানীং। সে টাকা পয়সা বিশেষ কিছু পায়নি, তবে থালা-বাসন-গ্লাস থেকে আরম্ভ করে ধুতি, পাঞ্জাবী আর জুতোগুলো পর্যন্ত বস্তা বেঁধে নিয়ে চলে গেছে। জানতো ফটকে কী রকম সৌখীন লোক। তার তো এমনিতে বিশটা ধুতি পাঞ্জাবী, পঁচিশ জোড়া জুতো। দেখে শুনে ফটকে মামা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। আমিও টিপ্পনী কেটেছিলাম—কী মামা গরীবের কথা বাসি হলে—

তা মামা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল—বাজে বকিসনে নীলে। আমি আজই এর বিহিত করছি।

বলে তক্ষুনি উধাও। চারদিন আর মামার পাত্তা নেই সহরে। আজ গিয়ে দেখি এই কাণ্ড! ঘরে সেই বিষ্টুপুরের কেষ্ট দারোগার মেয়ে বসে আছে মাথায় দেখি লাল ডগডগে সিঁদুর পরা। আমায় দেখে ফিক্ করে হেসে বললে—আসুন!

আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমার বে ভেস্তে দিয়ে এখন মামা নিজেই কি না বে' করে এল। বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর। অমন মামার মুখ দেখতে নেই। দাও একটা সিগারেট দাও সন্তদা। দেখি কি করে এর শোধ নেওয়া যায়।

দিন পাঁচেক পরের কথা। আজ নয় কাল করে ফটিক চাঁদের বৌ দেখতে যাওয়ার দিনটা ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছিল। সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরেই সটান গেলাম ফটীকের বাসায়।

বাইরে থেকে হাঁক দিলাম- ফটীকচাঁদ আছ নাকি?

প্রথমে কোন সাড়াই পেলাম না। বার চার পাঁচ জোরে জোরে ডাক দেবার পরে ফটীক নিজে এসে দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল। দেখি তার মুখ চোখ বসে গেছে, চেহারাটা যেন তিনমাসের রুগী।

চিঁ চিঁ করে বললে—আয় সন্তু ভিতরে আয়।

ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁরা তোর হয়েছে কী? তা ছাড়া ঘর দোরের এ কি অবস্থা! ড্রইং রুমের সোফাসেট ফার্ণিচার সব গেল কোথায়? বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়া ভাব।

ফটীকচাঁদ আগের মতো চিঁ চিঁ করে বললে—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই।

খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বললাম- নতুন বৌয়ের কি কোন অমঙ্গল?—

দাঁতে দাঁত পিষে ফটীকচাঁদ বললে—তাহলে তো আমি বাঁচতুম। এ যে আমায় পথে বসিয়ে গেছে। বাড়ীর সমস্ত ফার্ণিচার বেচেছে। গত পরশু হরিহর ব্যাঙ্ক উঠে যাবে গুজব শুনে আমার যথাসর্বস্ব প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা তুলে এনে বাড়ীতে রেখেছিলাম। মফঃস্বলে বায়না ছিল গতকাল। ভেবেছিলাম ফিরে এসে ষ্টেট ব্যাঙ্কে জমা দেব। তা তার সমস্তটা নিয়ে ভেগেছে শয়তানী।

বললাম—বলিস কিরে? এই যে শুনলাম দারোগার মেয়ে বিয়ে করেছিস—?

রাগে ফেটে পড়তে পড়তে ফটীক বললে—দারোগা নয় দারোগা নয় ডাকাতের মেয়ে। জ্যান্ত

ডাকাত, একেবারে গাং ডাকাত! ও আমায় পথে বসিয়ে গেল—এই ছাখ আবার চিঠি লিখে রেখে গেছে।

বলে একচিলতে কাগজ ফটীক আমার সামনে মেলে ধরল। তাতে লেখা আছে—তুমি যে এতোদিন বিয়ে না করে ছত্রিশ গণ্ডা মেয়ের সঙ্গে রাসলীলা চালাতে তা বিয়ের আগে আমাকে বা আমার বাবাকে ঘুনাক্ষরে জানাওনি। ভাগ্যিস নীলু আমায় সেইসব মেয়েদের লেখা চিঠিগুলো দিল তাতেই জানতে পারলাম তুমি আসলে কী চীজ। তোমার মতো দুশ্চরিত্রের সঙ্গে আমার আদবে পোষাবে না। তাই তোমার সব টাকা কড়ি নিয়ে আমি চললাম। আমাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো না। জানতো আমার বাবা কেষ্ট দারোগা, যার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তুমি বিষ্টুপুরে গেলে নিস্তার পাবে না। ইতি— তোমার যম।

চিঠিটা পড়ে ফটিকচাঁদের মুখের দিকে তাকালাম। ফটীকচাঁদ চিঁ চিঁ করে বললে—নীলেটার সন্ধান আমায় দিতে পারিস সন্তু। চিঠিগুলো যে কখন সরিয়েছিল টেরই পাই নি। এবার দেখা পেলে জ্যান্ত খুন করব।

সভা যখন হোল তখন মঞ্চ হতে আর কত দেরী!

সাহিত্য সভা থেকে অভিনয়ের মঞ্চে চলে এলেন উনবিংশ শতকের অন্যতম স্মরণীয় বাঙালী মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১৮৫৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। তারপর এল বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ।

১৮৫৬ সনের ১১ই এপ্রিল···অভিনীত হোল ভট্টনারায়ণের 'বেণী সংহার'। কালীপ্রসন্নও মঞ্চে নেমে পড়লেন। দর্শকরূপে এলেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার আর্থার বুনার, ভারত সরকারের প্রধান সচিব সিসিল বিডন প্রভৃতি গণ্যমান্যরা।

প্রচুর প্রশংসা পেলেন কালীপ্রসন্ন।

অভিনয় যখন হোল তখন আর নাটক রচনা বাকী থাকে কেন! ১৮৫৭ সনে কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর অনুবাদ প্রকাশ করলেন কালীপ্রসন্ন, অভিনয়ে রাজা পুরূরবার ভূমিকায় অংশ নিলেন তিনি নিজে। স্বনামধন্য উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ও এতে অবতীর্ণ হলেন। কলকাতার সমস্ত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ সেদিন সিংহবাড়ীতে ভেঙে পড়েছিল অভিনয় দেখতে।

জাতির জ্ঞানী-গুণীদের অবদানে বাঙলা রঙ্গমঞ্চ সমৃদ্ধ।

আজকের দুনিয়া

পৃথিবীর নানাস্থানে মিশনারী পাঠিয়ে খৃষ্টধর্মাবলম্বী দেশ ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্য করেছেন এবং কোন কোন দেশে তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য প্রথমেই মিশনারী পাঠানো যে অত্যাবশ্যক সেটাও স্বীকার করেছেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে গ্রহাদিতে এ উদ্দেশ্যে মিশনারী পাঠানো চলবে কিনা এবং সেই সব গ্রহে ধর্মপ্রচার কাদের উপরে করতে হবে, এও একটা সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, জগতের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ প্রশ্ন করছেন—"Now mankind is hoist on the great brink of conquering space, what sort of missionaries are we going to send out into the wilderness among the stars ?"—কথাটা হেসে উড়িয়ে না দিয়ে বিশেষ করে ভেবে দেখবার মত।

ডেলি মিরর্

* * * *

হাসপাতালে নার্সের কাজ মানবহিতৈষণার দিক দিয়ে যে খুবই গৌরবজনক, তা'তে সন্দেহ নেই। প্রায় একশো বছর আগে Crimean যুদ্ধে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল যে আদর্শ সেবাব্রতিনীদের সামনে ধরেছিলেন, আজ তার মহিমা ও প্রভাব জগতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি অতি সাবধানে চারিত্রিক বিশুদ্ধতার মধ্য দিয়ে নার্সের কাজ যে কত পবিত্র সেটা জগৎকে জানিয়ে গেছেন, "Determined that nursing should become a respectable profession for women, she laid her plans with the utmost care." অবশ্য আজকাল অনেক স্থলে এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। তবে Florence Nightingale'ও যে একথা না বুঝতেন তা' নয়, তাই তিনি কোন পুরুষের হাতে এঁদের ভার দিতে চাননি, "An important part of her plan was that the control of the nursing staff should be in the hands of a woman." এর কারণ সহজেই অনুমেয়।

ব্রিটেন

* * * *

জগতে কোন্ দেশের লোক বেশী চা-খোর, এই নিয়ে একটা বিশ্ব-কমিটি বসে ও জোর অনুসন্ধান চলে। শেষে দেখা গেল ব্রিটেনের কাছে কেউ নয়। ব্রিটেনে প্রত্যেক লোকেই চা খায়, বাদ কেউ যায় না। সেখানে "চা খাই না" কথাটা নেহাৎ অভদ্রতা। তাই "Britain is still the greatest nation of tea-drinkers in the world." সেখানে প্রত্যেক লোক গড়পড়তা প্রায় সাড়ে নয় পাউণ্ড চা খায়। অবশ্য চা ত খায়ই, তার সঙ্গে আরও অন্য "beverage"ও থাকে। এত চা খায় বলেই তারা খুব পরিশ্রমী।

ট্রেণ্ড্

* * * *

প্রাচীনতম সভ্যতার যে সব নিদর্শন পৃথিবীর নানাস্থানে এখনও পাওয়া যায়, তাদের কাছাকাছি যেতে পেরেছে ভিয়েটনামের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। হ্যানয় প্রদেশের খুব নিকটে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যে সব প্রাচীন জিনিষ আবিষ্কৃত হয়েছে, পণ্ডিতেরা সেগুলিকে দুই হাজার খৃঃ পূঃ বৎসরের সভ্যতার যুগের জিনিষ বলে প্রমাণিত করেছেন। তা' ছাড়া পাহাড়ের গোপন গুহায় পাওয়া গেছে আদিম মানবযুগের

বহু চিহ্ন। "The mountains are tunnelled with grottoes and caves in which traces of primitive man can be found: stone axes, large-skulled human skeletons etc." এ সব ছাড়াও পরবর্তী আদিম সভ্যতাযুগেরও জিনিষ পাওয়া গেছে, যথা—"pottery, porcelain and articles in bronze etc." পৃথিবীতে যারা দম্ভভরে মনে করে আমরাই একমাত্র সভ্যজাতি, তাদের কাছে এসব আবিষ্কার বিস্ময়সৃষ্টি করবে, সন্দেহ নেই।

ভিয়েট্‌নাম

* * * *

জগতের বিভিন্ন দেশের তথ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন পুরুষের চেয়ে নারীরা দীর্ঘজীবিনী হন। এর কারণ কি? কি গোপন শক্তির উৎস নারীদের মধ্যে পাওয়া যায় যাতে এরকম দীর্ঘজীবন লাভে সহায়তা হয়। নারীত্বের মধ্যেই এই শক্তি বর্তমান, পুরুষের মধ্যে নয়। "Why are women outliving men in the majority of countries? The answer many scientists now believes may lie in the very essenee of femininity." শুধু মানুষের মধ্যে নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও নারীজাতির এ শক্তি আছে। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা এ তথ্য বোঝেন, তাই "all the animals shot into space to date have been female."

ফেমিনা

* * * *

Darwin বানর থেকে মানুষের বিবর্তন প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছেন, অবশ্য আজকাল তাঁর ও "Theory" খুব বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে পণ্ডিতেরা অভিমত লিখেন। অথচ মাঝে মাঝে বানর-জগতের এমন সব খবর পাওয়া যায়, যা'তে বিবর্তন-বাদকে একেবারেই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি একটি গরিলাকে কিছু শিক্ষা দিলে সে রং-তুলি নিয়ে এমন একটি ছবি এঁকেছে, যাতে বৈজ্ঞানিকেরা চমৎকৃত হয়ে গেছেন ও কেমন করে গরিলা নিজে নিজে এমন একটি ছবি আঁকতে পারল, সে বিষয়ে গবেষণা করছেন। যে ছবি এই গরিলাটি এঁকেছে সেটি সমালোচকদের মতে "The style it would seem is no more abstract than that of many contemporary human artists."

ইলাস্‌ট্রেটেড্ উইকলি অব্ ইণ্ডিয়া

* * * *

দুধের মধ্যে মাত্র জলটুকু বাদ দিলে সমস্তটা যে মাখনে পরিণত করা যেতে পারে এমন একটি "power churn" আবিষ্কৃত হয়েছে। তা ছাড়া দুধের জলীয় অংশটিও "is being turned into dried skim milk," এবং এটা নাকি "protein deficiency"র পক্ষে খুব উপকারী। দুধ থেকে অনেক কিছুই তৈরী করা যেতে পারে এবং অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাহায্য নিলে যে অসাধ্যসাধন করা যায় তার পরিচয় ক্রমেই পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন দেশের dairy farmগুলিতে। ভারত এখন অবশ্য এ বিষয়ে পিছিয়ে আছে, কিন্তু আশা করা যায় মাখন তৈয়ারী ব্যাপারে ভারত যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে, সেদিন শীঘ্রই আসছে।

কমনওয়েল্‌থ্ টুডে

এগারো

রামানন্দবাবু সময় নষ্ট করা পছন্দ করেন না। ঘরে গিয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করে এলেন। গলাবন্ধ কোটের উপর গরম চাদর। জিজ্ঞাসা করলুম: কোথায় বেরচ্ছেন ?

জানিনা।

বেড়াতে বেরচ্ছেন তো ?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না।

বললুম: সমুদ্রের ধারে, না শহরে ?

আপনারা কি এসব ঠিক করে বেরিয়েছিলেন ?

হেসে বললুম: না।

তবে আমাকেই বা কেন জিজ্ঞেস করছেন !

আপনি বুঝি—

ঋতার সঙ্গে বেরবো, একথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই রামানন্দবাবু বললেন: তবে কি আপনার সঙ্গে বেরব !

কিন্তু—

কিন্তু কী ?

তিনি যদি—

আলবৎ যাবেন, আপনার সঙ্গে দুপুরবেলায় যদি বেরতে পারেন তো এবেলায়—

রামানন্দবাবু নির্বাক হয়ে গেলেন।

চেয়ে দেখলুম, দরজার আড়ালে ঋতার শাড়ির আঁচল দেখা গেছে। বলছে: সেই ভাল, আজ সন্ধ্যেবেলায় বিশ্রামই নেওয়া যাক।

কথাটা আমাদের নয়, বলল তার দাদা কিংবা বৌদিকে। তারপরেই বেরিয়ে এল।

রামানন্দবাবু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ঋতা বলল: আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

রামানন্দবাবু বললেন: এঁর কথা ইনিই জানেন, আমি আজ বেরব না।

দেখে তো উল্টো মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক নিজের কোট আর চাদরের দিকে চেয়ে বললেন: শরীরটা তেমন ভাল নেই।

ঋতা হেসে বলল: আপনিও বসে থাকবেন নাকি ?

এ প্রশ্নের জন্য আমি তৈরি ছিলুম, বললুম: না।

কোথায় যাবেন ?

মন্দিরে।

মন্দিরে !

দুজনেই যেন চমকে উঠলেন।

আমি উত্তর দিলুম না দেখে ঋতা বলল : মন্দিরে গিয়ে কী করবেন ?

গম্ভীর গলায় বললুম : জগন্নাথ দর্শন এখনও হয়নি।

ঋতা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, বোধহয় বুঝবার চেষ্টা করল আমি সত্যি বলছি কিনা, তারপর বলল : ধর্মে অনুরাগ থাকা ভাল।

রামানন্দবাবু ভেংচি কেটে বললেন : অনুরাগ, না আহ্লাদ ?

আহ্লাদ থেকেই অনুরাগের জন্ম। আমাকে দেখে আপনার আহ্লাদ হচ্ছে না বলেই এই রাগ বিরাগ বিতরাগ। রাগারাগি না করে আসবেন আমার সঙ্গে ?

রামানন্দবাবু তেড়ে উঠলেন : ক্ষেপেছেন আপনি !

কিন্তু ঋতা তাঁকে চমকে দিল, বলল : আমাকে সঙ্গে নেবেন ?

ছি ছি আপনি কেন মন্দিরে যাবেন !

রামানন্দবাবু বলে উঠলেন : চলুননা, আমরা সবাই মিলে যাই।

ঋতা বলল : তবে আর কি, আপনারা দুজনেই বেরিয়ে পড়ুন। বেশ মানাবে।

বলে ভিতরে চলে গেল।

আমি চায়ের অপেক্ষা করছিলুম। রামানন্দবাবু এবারে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বললেন : ব্যাপার কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা।

আমি উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলুম না।

রামানন্দ বাবু বললেন : কথা কইছেন না যে ?

কী বলব ?

কিছু বলবেন তো !

যা বলবার তা আপনিই বলুন।

ভদ্রলোক গলা নামিয়ে বললেন : মেয়েটার আক্কেল দেখছেন ? এই যাব বলছে, এই না।

আপনিও তো তাই করছেন।

আমি ! ক্ষেপেছেন আপনি ?

তারপরেই নরম হয়ে বললেন : আমি কি নিজের ইচ্ছেয় এমন করছি !

বড় অসহায় সুর। আমি আর প্রতিবাদ করলুম না।

চা এসেছিল। চা খেয়ে আমি পথে নেমে পড়লুম।

রামানন্দবাবু বললেন : আপনি চললেন তাহলে ?

যেতে দিন, যেতে দিন। পিছনে আর ডাকবেন না।

এ নিগমবাবুর কণ্ঠস্বর। ভদ্রলোক তাঁর বাইনকুলার নিয়ে বেরিয়েছিলেন। আর তাঁর পকেট রেডিও। পকেটের ভিতর আস্তে আস্তে রেডিও বাজবে, আর তিনি চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে সমুদ্রতীরের জনতা দেখবেন। বসে বসেই তাঁর সময় কাটবে।

রামানন্দবাবু একবার ভিতরের দরজার দিকে তাকালেন।

ডান হাতে আমি মন্দিরের পথ ধরেছিলুম। খানিকটা এগিয়ে মনে হল, এ ভুল করেছি। মন্দির আজ নির্জন নাও হতে পারে। শ্বেতা যদি বেরোয় তো মন্দিরের দিকেই আসবে। আমার শান্তি ভঙ্গ করে সে কৌতুক উপভোগ করবে। তবে কি সমুদ্রের দিকে যাব? কিন্তু তাহলে তো হোটেলের সামনে দিয়েই ফিরতে হবে। রামানন্দবাবু ঘাঁটি আগলে বসে আছেন। কোনরকমে তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও নিগমবাবুর বাইনকুলারকে ফাঁকি দিতে পারব না। তিনি দেখতে পেলেই রামানন্দবাবুকেও দেখাবেন। হয়তো শ্বেতাও দেখবে। তার চেয়ে আর কোথাও যাই! কোন মঠে কিংবা আশ্রমে।

পুরীর পথে তখন আলো আছে, কিন্তু রৌদ্র নেই। পথিক আছে, কিন্তু জনতা নেই। পায়ে পায়ে আমি মন্দিরের দরজাতেই পৌঁছে গেলুম। চমক ভাঙল পাণ্ডাদের কথায়। তারা সামনের পথ রোধ করে মন্দিরের ভিতর নিয়ে গেল। আমি কি সত্যিই খুব অন্যমনস্ক ছিলুম, না অন্যমনস্কতার নামে কোন সুপ্ত ইচ্ছারই প্রশ্রয় দিয়েছি!

অন্যমনস্ক থাকা আর অসম্ভব। পাণ্ডারা ছেঁকে ধরেছেন: পূজা দেবেন?

আটকিয়া বন্ধন?

আপনার কোন চিন্তা নেই। পঞ্চায়েতের খাতায় শুধু চার পুরুষের নাম লিখে দিন, বাকি ব্যবস্থা আমরাই করে দেব।

সাত রকম আটকিয়া আছে, একশো বত্রিশ থেকে পাঁচ হাজার ছশো পর্যন্ত। যা আপনার খুশি। কোন জবরদস্তি নেই।

আটকিয়া মানে আমি জানিনা, কিন্তু আমাকে এরা খুবই আটকেছে। পুলিশের মতো ঘেরাও করে বোধ হয় পঞ্চায়েতের দপ্তরের দিকেই নিয়ে চলল।

আমি প্রতিবাদ করিনি, আত্মরক্ষার চেষ্টাও করিনি। এই মৌন সহিষ্ণুতা আমার সমর্থন মনে করে পাণ্ডারা উল্লসিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই একরকমের কুরুক্ষেত্র বাধল। কে আমাকে আগে ধরেছে, অর্থাৎ আমার পাণ্ডা হবার অধিকার কার। এই নিয়েই যুদ্ধ। বচসা যখন হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে, আমি তখন সযত্নে সরে পড়লুম। ধরা পড়বার সমূহ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী তখন দুজনে ঠেকেছে। অন্য পাণ্ডারা বোধ হয় দেখেও দেখলেন না।

আটকিয়া বন্ধনের গল্প পরে জেনেছিলুম। বাঙালীরা সংক্ষেপে বলেন আটকে। মানে পঞ্চায়েতের খাতায় টাকা জমা দিয়ে জগন্নাথদেবের ভোগের ব্যবস্থা করা। একশো বত্রিশ টাকায় সাধারণ ডালভাত তরকারি। সাদা খিচুড়ি তিনশো বাট, মশলা দেওয়া চারশো চৌত্রিশ। সাড়ে পাঁচশোর পুরী ও ক্ষীর ভোগ, সাড়ে সাত শোয় মালপোয়া, আর মোহনভোগ এক হাজার পাঁচশো পঞ্চাশে। পাঁচ হাজার ছশো টাকা খরচ করলে ছাপান্ন পদ ভোগে পড়বে। এই ব্যবস্থা শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র মহাত্ম্যে মুদ্রিত আছে। সাধারণ যাত্রীর জন্যে সংক্ষেপ ব্যবস্থাও আছে। পাণ্ডার সঙ্গে সেসব দরাদরির ব্যাপার। সাড়ে সাত টাকার নিচে আর আটকে হবে না। অন্ন ভোগ হবে। পুজো হবে, মালা হবে। পুরীতে এখনও এক পয়সার মূল্য আছে।

পাণ্ডার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ভেবেছিলুম, কোন নির্জন স্থানে গিয়ে বসব। কিন্তু পিছন থেকে এক বালক বলল: যে দ্বার দিয়ে আপনি ভিতরে এলেন, তার নাম সিংহদ্বার। এইটিই প্রধান দ্বার।

আমার বড় কৌতুক বোধ হল।

বালক তা লক্ষ্য করে বলল : উত্তরে হস্তীদ্বার, অশ্বদ্বার দক্ষিণে, আর পশ্চিমে খাঞ্জা দ্বার।

আমি তাকে থামিয়ে দিলুম না। উৎসাহ পেয়ে বালক বলল : মন্দিরের চারিদিকে এই প্রাচীরকে মেঘনাদ বলে। উঁচু চব্বিশ ফুট। আর বাইশ ফুট চওড়া। উত্তর দক্ষিণে লম্বা ছশো ছেষট্টি ফুট, আর ছশো সাতাশি ফুট লম্বা পূর্ব পশ্চিমে।

আমার পিছনে চলতে চলতে বালকটি বলে চলেছে : উড়িষ্যার অন্য সব মন্দিরের মতো এ মন্দিরেও চারটি ভাগ—মূল মন্দির নাটমন্দির ভোগমন্দির ও জগমোহন। প্রাঙ্গণ দুটি—অন্তর্প্রাঙ্গণ ও বহির্প্রাঙ্গণ।

বালকটি প্রচুর সাহস সঞ্চয় করেছে। বলল : অরুণ স্তম্ভ থেকে দেখাব ?

আমি কোন উত্তর দিলুম না।

বালকটি আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন না করে বলল : মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে বাইশ হাত উঁচু কালো পাথরের স্তম্ভ। গরুড় স্তম্ভ ভোগ মন্দিরে। প্রথমেই এঁকে প্রণাম করে আলিঙ্গন করতে হয়। অন্তর্প্রাঙ্গণের দেবদেবীর নাম বলব ?

আমি উত্তর দিলুম না।

বালক বলল : পূর্বদিকে চৈতন্য, রাধাশ্যাম ও ভাণ্ডার, রাধাকৃষ্ণ বদরি নারায়ণ ও পুরনো রন্ধনশালা। উত্তরদিকে কৃষ্ণ পটলেশ্বর জগন্নাথ সূর্য নারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ। দক্ষিণ দিকে রোহিণী কুণ্ড বিমলা ভুষণ্ডি কাক গণেশ চন্দনগৃহ নৃসিংহ মুক্তি মণ্ডপ ক্ষেত্রপাল সূর্য বটেশ্বর মার্কণ্ডেয় মঙ্গলা ও বটকৃষ্ণ। পশ্চিম দিকে লক্ষ্মী সরস্বতী মাখনচোরা গোপীনাথ বড় গণেশ রাধাকৃষ্ণ ও রথযাত্রার আসবাব গৃহ।

বালক এর পরে যে বহির্প্রাঙ্গণের দ্রষ্টব্য তালিকা শোনাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগে একটু এগিয়ে এসে আমাকে লক্ষ্য করল। আমি শুনছি কিনা সেকথা হয়তো জানা দরকার। মনে মনে কিছু বিবেচনা করে বলল : বাহিরের প্রাঙ্গণে একবার যাবেন কি ? এখনো পরিষ্কার আলো আছে।

কোন উত্তর না দিলে সে কী করে আমি দেখতে চাইলুম।

বালক বলল : নতুন রন্ধনশালা হয়েছে পশ্চিমদিকে। অসংখ্য উনুন। প্রতিটি উনুনের উপর সারি সারি হাঁড়ি চাপিয়ে ভাত রান্না হয়। দেখবার জিনিষ।

দেখবার জন্য আমি কৌতূহল প্রকাশ করলুম না।

বালক বলল : ভাণ্ডার গৃহ একাদশী গৃহ গঙ্গা-যমুনা কূপ ভেত মণ্ডপ কৃষ্ণ ও ময়দার কল—সবই ঐদিকে। উত্তর দিকে মহাদেব ঈশানপুর লোকনাথ শীতলা উত্তরায়ণ মহাবীর রাধাকৃষ্ণ মহাদেব ও বৈকুণ্ঠপুরী। দক্ষিণদিকে আনন্দ বাজার স্নানবেদী ও চাহনি মণ্ডপ। শিব পূর্বদিকে।

আমি নিশ্চিন্ত হলুম। আর তার নিশ্চয়ই কিছু বলবার নেই। এবারে কয়েকটা পয়সা পেলেই সরে যাবে। আমি পকেটে হাত দিলুম।

বালক তা দেখেও দেখল না। বলল : অক্ষয় বট দেখুন। ভগবানের বপু স্বরূপ।

অন্য ব্রাহ্মণেরা পথরোধ করে বললেন : স্পর্শ করুন। ধন, মান ও পত্নী পুত্রকন্যা যা চাইবেন, তাই পাবেন। এ হল কল্পতরু।

একজন স্ত্রীলোক আঁচল পেতে বসে আছে। কখন এই কল্পতরু থেকে পাকা ফল পড়বে, তারই অপেক্ষা। কল্পতরুর সেইতো বর। খানিকটা খাবে, খানিকটা মাদুলী করে গলায় পরবে।

ব্রাহ্মণদের আমি এড়িয়ে গেলুম।

বালক বলল : এইখানে দাঁড়িয়ে মন্দিরের কারুকার্য দেখুন।

বলে ঠিক উপরের দিকে তাকাল।

তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। মন্দির গাত্রে যে এমন অশ্লীল মূর্তি খোদিত থাকতে পারে, তা আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কোনারকের মন্দিরে নাকি এমন মূর্তি অনেক আছে। কিন্তু পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে এ দৃশ্য মর্মান্তিক মনে হল। আমি চোখ নামিয়ে নিলুম।

আর সেই মুহূর্তেই শুনলুম ঋতার কণ্ঠস্বর : মন্দিরের কারুকার্য দেখছেন?

আমার লজ্জার সীমা রইল না। পালিয়ে গিয়ে যে আত্মরক্ষা করব, তার পথ নেই। একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। কিন্তু তার পরেই নিজেকে সামলে নিলুম। আমার লজ্জা কিসে! যারা এ মূর্তি গড়েছে, তারা লজ্জা পাক। কিংবা লজ্জা পাক এই মেয়েটা! আমাকে অনুসরণ করে এর এখানে আসবার তো কোন প্রয়োজন ছিল না। সঙ্গে তো কাউকেই দেখছি না! দাদা বৌদি নেই, রামানন্দবাবুও নেই। তবে কি সে একা এসেছে?

ঋতা বলল : এমন মুসড়ে পড়লেন কেন?

বললুম : আপনাকে দেখে।

কিন্তু আমাকে রক্ষা করল সেই ব্রাহ্মণ তনয়। বলল : এই দেউল নির্মাণ হয় উৎকলের রাজা গজপতি বংশীয় অনঙ্গ ভীমদেবের অধিকার কালে। তিরিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। জগন্নাথদেবকে রণজিৎ সিং সাড়ে তিন কোটি টাকার কোহিনুর দিয়েছিলেন।

বাধা দিয়ে ঋতা বলল : এসব কথা রামানন্দবাবুকে শোনাতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলুম : কোথায় তিনি?

ঋতা হেসে বলল : দাদা বৌদির সঙ্গে চাল কিনছেন। পুরীর চাল ভাল।

তাঁর চালটিও ভাল।

ঋতা হেসে উঠল।

বালক তখন মন্দিরের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। চেঁচিয়ে বলল : তাড়াতাড়ি চলে আসুন। এখন একেবারে ভিড় নেই।

আমরা দুজনেই এক সঙ্গে এগিয়ে গেলুম।

কালো পাথরের বেদীর উপর আমরা জগন্নাথ দর্শন করলুম। ঠুঁটো জগন্নাথ একা নন। সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রা, সুদর্শন চক্রও আছে। কাঠের রঙ করা মূর্তি। তাই কলেবর পরিবর্তন করতে হয়। নবকলেবর বিরাট উৎসব।

ঋতা বলল : সুভদ্রা তো কৃষ্ণের বোন। এরা বলছিল বউ।

এ নিয়ে অনেক তর্ক। সেসব তর্কে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তাই বললুম : একটা কিছু ভেবে নিলেই হল।

বেশ বলেছেন।

কেন?

বউ আর বোন কি এক জিনিষ হল?

একালে অবশ্য দাদা বলে আলাপ শুরু করে বরমাল্য গলায় দেবার গল্প শুনেছি।

ঋতা রাগত ভাবে বলল : প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

রামানন্দবাবু হলে এড়িয়ে যেতেন না।

তা ঠিক। নিজের জানা না থাকলে জেনে নেবার চেষ্টা করতেন।

রামানন্দবাবু ঠিক এই সময়েই এলেন। দুহাতে দুটো ভারী ঝোলা। বোধহয় পুরীর চাল বইছেন। তাঁর পিছনে ঋতার দাদা বৌদি। দাদা ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে বললেন: রামানন্দবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা। একটা ঝোলাও আমাকে বইতে দিচ্ছেন না!

বৌদি বললেন: তুমি তো নিশ্চিন্ত হয়েছ দেখছি।

কিন্তু রামানন্দবাবু এ সবের ধারে কাছেও ঘেঁষলেন না। বললেন: আমার সম্বন্ধেই কোন কথা হচ্ছিল মনে হচ্ছে।

বললুম: ঠিক ধরেছেন। ইনি আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলছেন, আপনি হলে একটা সদুত্তর তিনি নিশ্চয়ই পেতেন।

প্রশ্নটা না শুনেই রামানন্দবাবু বললেন: তা পেতেন বৈ কি।

বললুম: তা হলে সুভদ্রা জগন্নাথের বোন না স্ত্রী সেই কথা বলুন।

সর্বনাশ! সুভদ্রা কেন জগন্নাথের স্ত্রী হবেন? জগন্নাথের স্ত্রী তো লক্ষ্মী।

ঋতা বলল: পাণ্ডারা যে অসম্ভব কথাই বলছে।

ব্রাহ্মণ বালকটি চপিচুপি বলল: চন্দন যাত্রার সময় সুভদ্রার ভোগমূর্তি লক্ষ্মী সঙ্গে যান।

বিপদ দেখুন।

রামানন্দবাবু তার ঝোলা দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, বললেন: ধরুন তো।

আমি হাত বাড়িয়ে সেই ভারী ঝোলা হাতে নিলুম।

রামানন্দবাবু পকেট থেকে তাঁর খাতা পেন্সিল বার করলেন। একটা পাতা খুলে খস খস করে কিছু লিখেও ফেললেন। বললেন: টুকে নিলুম। এ বিষয়ে—

গবেষণা করতে হবে।

কথাটা আমি সম্পূর্ণ করলুম।

রামানন্দবাবু কটমট করে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: কিছু যদি মনে না করেন তো আমি আপনাকে একটু সাহায্য করতে পারি।

উত্তর ঋতা দিল, বলল: করুন না।

দেবতা তিন জাতের। বৈদিক, পৌরাণিক ও গ্রাম্য। গ্রাম্য দেবতাকে টানাটানি করে যখন পৌরাণিক সম্মান দেবার চেষ্টা হয়, তখনই এ গোলমাল।

ঋতার দাদা বিস্ময় প্রকাশ করলেন: জগন্নাথকে আপনি গ্রাম্য দেবতা বলছেন?

কারণ আছে। শুধু আকার আকৃতির জন্যে নয়। সম্বন্ধের এইসব অসামঞ্জস্যের জন্যও আমাদের সন্দেহ করা উচিত। পুরাণে যদি বিশ্বাস থাকে তো দেখবেন, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতিকে পাঠিয়েছিলেন নীলমাধব দর্শনে। চণ্ডালের দেবতা নীলমাধব। বসুশবরের গৃহে বাস করে বিদ্যাপতি সেই মূর্তি দর্শন করেছিলেন। বসুর পুত্র দৈতাপতি, তারই বংশধর দৈতা ও পতি। দৈতারা শ্রীমূর্তির অঙ্গরাগ করে। পতিরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে পূজার অধিকার লাভ করেছে; রন্ধনশালার শোঁয়ার শবর শব্দেরই অপভ্রংশ।

রামানন্দবাবু আমার দিকে তাকালেন বিহ্বলের মতো। কোন কথা কইতে পারলেন না।

বললুম: আর একটি কথা নোটবুকে টুকে রাখুন। বৌদ্ধরা এক সময় জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তিকে বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতীক বলে মনে করতেন। এ কথার আলোচনা না করলে আপনার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকবে।

সকলের মুখের দিকে চাইলে নিজেকে হয়তো হিরো ভাবতে ইচ্ছে করবে। তাই কোনদিকে না চেয়ে আমি মন্দির থেকে বেরিয়ে এলুম। [ক্রমশঃ

ক্যান্সার

নির্মলেন্দু মান্না

আমার স্ত্রী বললেন—তিনি যা বললেন তা আপনারা, বিশেষতঃ যাঁরা ভাড়া বাড়ীতে থাকেন এবং মাঝে মধ্যে বাসাবদল করতে আমারি মত বাধ্য হয়েছেন তাঁরা এর মধ্যে নতুন কিছু পাবেন বলে যে কথাটার উল্লেখ করছি তা নয়, তবে ব্যাপার কি জানেন আর দশটা কথার মত এটা নেই! কথার কথা ছিল না, কিছুটা সত্য ছিল।

তাঁর দীর্ঘ বকবকানি যে কোন নির্বাচনী বক্তৃতার মত আগে থেকেই অনেকটা জানা ছিল, তবু যখন তিনি বললেন, জায়গাটা বড় অদ্ভুত, এ কোথায় আসলে গো, তখন আমি পরিবেশ সম্বন্ধে ঈষৎ সচেতন না হয়ে পারিনি।

হাওড়া সহরটাই তো আসলে সহরতলী, তারও উত্তরে রেল পুল পার হয়ে এলে হঠাৎ মনে হয় একেবারে পাড়াগাঁয়ে এলুম। সহর বলতে যা বোঝায়, অজস্র বাড়ী আর ততোধিক লোক, লোকের ভীড়—যেখানে লোক আর লোকই থাকে না শুধু ভীড়টা চোখে পড়ে, ভয়ঙ্কর রকম মানুষ হারিয়ে যাওয়া ভীড়—প্রায় অরণ্যের মত, দুর্ভেদ্য, দুর্গম, নাঃ তার চিহ্নমাত্র এখানে নেই।

আমার স্ত্রী বললেন, বাব্বা, একেবারে পাণ্ডব বর্জিত দেশ, একটা কথা কইবার জন নেই।

স্ত্রীদের অনুযোগ কবে আর সমে এসেছে। একথা উনি ভুলে যাচ্ছেন যেখানে পাণ্ডবগণ ছিলেন সেখানে কৌরবপক্ষীয়দেরও অভাব ঘটেনি। হয়তো আমরাই কৌরবপক্ষে ছিলুম, দুবেলা কলের কাছে কুঁজো কলসী বসানো নিয়ে 'নাহি দিব সুচ্যগ্র মেদিনী' বলে লড়াই করে অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়েছি। তাছাড়া ওপর থেকে নিত্য ছাই ফেলার সেই কেলেঙ্কারীটা যাই বলো, স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছি, এবার আমরাই ওপরে।

—আর তাছাড়া পাতকুয়ো, জল, অফুরন্ত জল, আমি বোঝাতে চেয়েছি, তিনিও বলে উঠেছেন, তাছাড়া পাশেই পুকুর, শান বাঁধানো ঘাট, কাপড় ছাড়ার ঘেরা ঘর, কিছুরই অসুবিধে নেই, এমন কি ডুব মারারও—

এই কথাটার আমি চমকে উঠেছি, হ্যাঁ ভীষণ চমকে উঠেছি, কথাটা আমার কানে কি রকম লাগল ডুবে মরারও—

আমাদের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের অনেক কথা মনে পড়ে গেল, ঝগড়া যে হয়নি তা নয়, তা ছাড়া দুজনেরই একটা অতৃপ্তি রয়ে গেছে, অনেক দীর্ঘনিশ্বাস, চোখের জল, চিত্তক্ষোভ, জানি আমি মরে গেলে উদ্ধার পাব না, আমার সন্তানাদি নেই, হয়নি, মানে আমার স্ত্রী—

তাবলে মরার কি আছে, তাছাড়া আমাদের দেহে মনে দিব্যি যৌবন, তাহলে কথাটা ডুব দেয়া অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ ডুব সাঁতার-টাঁতার হবে, হ্যাঁ আমি দেখেছি, আমার বাড়ীর পেছনেই, আঃ চমৎকার পুকুর মশাই, একটা নিখুঁত আয়তক্ষেত্র, একপাশে ঝাঁপ দেয়ার ছোটখাট মঞ্চ, আর জল এত পরিষ্কার যে দেখলেই আপনার ঝাঁপ দেয়ার ইচ্ছে হবে।

—ঝাঁপ দেয়ার ইচ্ছে হবে, হবেই, এমন সব কথা আমি শানপুরের হারাণ সামন্তকে বলেছি। শানপুর জানেন না? ওই যে রেলপুলের পর থেকেই যে গ্রামটা—ওটা হোল মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার বাইরে, অর্থাৎ—দাদা, সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে, হাত উল্টিয়ে বলেছেন হারাণবাবু, স্থানীয় যুবক সঙ্ঘের

প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি, যে সঙ্ঘ অমিতবিক্রমে গত দশ বৎসর যাবত সার্বজনীন পূজো করে আসছে আর শক্তিভিক্ষা চাইছে, কিন্তু পূজো করতেই ছেলেরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে যেটুকু শক্তি মা ভিক্ষা দেন তার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না।

হারাণবাবু আগ্রহ সহকারে বললেন, আর কি দেখলেন?

—উক্‌, বিস্তর জিনিষ মশাই, আমি বলতে গেছি আর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর কথাটা কানে বেজে উঠেছে, অদ্ভুত, বড়ো অদ্ভুত, আর তখনি চুপ মেরে গেছি।

হারাণবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন: আমরা আর কি করে দেখব, যা উঁচু প্রাচীর—

—আর যা বন্দুকধারী সেপাই, যুবক সঙ্ঘের কেউ একজন টিপ্পনী কেটেছে।

—আর যা বড়বাবুর চরিত্তির আর একজন মুখ ফসকে বলে ফেলেছে আর তার পরেই সব চুপ হয়ে গেছে।

আমার স্ত্রী বললেন, দেখবে এস। আমি তাঁর পিছু পিছু ছাদে উঠলুম, আঃ চোখ জুড়িয়ে গেল, এত সবুজ কোথায় ছিল!

কিন্তু, মনে একটা খটকা লাগল, বাড়ীর পেছনটায় যে অতখানি জায়গা, সব প্রাচীর ঘেরা, উঁচু প্রাচীর তার ওপর কাঁটা তারের বেড়া, তাহলে এই সবটাই বড়বাবুর। বড়বাবু? কি নাম তাঁর। তাঁর নাম কেউ জানে, কেউ জানে না। কিন্তু বড়বাবু বললে অনেকেই বুঝতে পারে। বিরাট লোহার কারখানা তাঁর। শ'য়ে শ'য়ে লোক কাজ করছে। রেল আর কলিয়ারীর একচেটিয়া অর্ডার সাপ্লায়ার। লোহা গলানোর একেবারে লেটেষ্ট ফার্নেস, ওয়েষ্ট জার্মানীর নতুন নিউম্যাটিক হ্যামার—ঢালাই—ফোর্জিং, হ্যামারিং —সে এক এলাহি ব্যাপার চালিয়েছেন।

কারখানার বর্ণনা করতে করতে হারাণবাবু লাফিয়ে উঠতেন, হ্যাঁ, কর্মী বটে, বাঘের বাচ্চা, ভোর ছ'টা থেকে রাত বারটা অবধি অবিশ্রান্ত কাজ—কাজ—চান নেই, খাওয়া নেই, যাওয়ার সময় নেই, কিন্তু —ওই এক দোষে গেলেন—হয়তো ওর দোষ নয়—যুগের দোষ—হাওয়ার দোষ—

যুবক সঙ্ঘের এক ছোকরা আমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিত: ওর আপিসে হারাণদা কাজ করেন, যে, বড়কত্তার ব্ল্যাকমার্কেটিঙের খবর কিছু কিছু রাখেন।

আমি অবাক। কালোবাজারে লোহা পাচার করা দোষের, খুবই দোষের, কিন্তু—হারাণবাবু যেমন বলেন—ওই এক দোষে উনি গেলেন, ডুবলেন, মরলেন, ওনার হয়ে এসেছে—এসব কথার মানে কি? ওঁর নামে কোনো পুলিশী অভিযোগ সেই, সমাজে, রাষ্ট্রে, সরকারী দপ্তরে—সর্বত্র উনি মহামাননীয় ব্যক্তি, আর টাকা—অজস্র অঢেল টাকা ওনার, তাছাড়া স্বাস্থ্য, অমন লম্বা-চওড়া সুপুরুষ চেহারা দেখা যায় না, তাহলে উনি মরতে যাবেন কেন!

আমার স্ত্রী আঙুল দিয়ে ছোট্ট একতালা বাড়ীটিকে দেখিয়ে বললেন, ওখানে থাকলে মানুষের আয়ু বেড়ে যায়।

আমি বললুম, হারাণবাবু ঠিউ উল্টো কথা বলেন।

অবশ্য আমার স্ত্রীর কথায় আমার সম্পূর্ণ সায় আছে। (কার না থাকে!) গেট পেরোলেই যে সুন্দর লন পাবেন আপনি ঘাস ছাঁটা কল পেলেই মনে হবে এখানেরই দুচারটে অবাধ্য ঘাস ছেঁটে দিয়ে যাই এখনি। তারপর ফোয়ারা। এখন তা ফুরফুর করে উঁচুতে জল ছুঁড়ে মারছে না, কিন্তু এত সুন্দর গঠন সেই নারীমূর্তির যে মনে হবে সে আকাশের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা কইছে, তার ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁটের ফাঁকে অনেক কথা জমে আছে, আপনি সরে গেলেই সে মুখর হয়ে উঠবে।

কিন্তু আপনি সরতে পারবেন না। আপনার শিল্পরসিক মন মুগ্ধ হয়ে দেখবে সেই ফোয়ারা, মেজাজ থাকলে একটা তুলনা মূলক আলোচনাও ফেঁদে ফেলতে পারেন। আপনার মনে হবে অসলো, রোম, লণ্ডনের সেইসব বিস্ময়কর ফোয়ারার কথা, ভিগল্যাণ্ড কি কার্ল মাইলসের মত শিল্পীর নামও স্মরণে আসবে। বড়বাবুর রুচির তারিফ করতে করতে আপনি এগোবেন, পাশে পড়ে থাকবে সাজানো বাড়ীখানা, যার জানলা বন্ধ এবং দরজায় তালা ঝুলছে। তারপরেই পড়বে ফুলের বাগান, লতাবিতান, কুঞ্জ, আর তার মাঝখানে শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি—আশ্চর্য সুন্দর অবয়ব, সুন্দর, সুঠাম, তবু আর্টের নামে তার ভঙ্গীটা আপনি বরদাস্ত করতে পারবেন না, দ্রুতপদে সেটুকু পার হলেই দেখবেন এক সুস্থির সরোবর এক নারীর মতই আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে 'যদি গাহন করিতে চাও—'।

আপনি সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়বেন, অনেক সুখস্মৃতির হাওয়ায় দুলতে দুলতে তাকিয়ে থাকবেন পরপারের ফলবাগানের দিকে।

—আর ঠিক তারপরেই আপনি যে অনেকের খর নজর এড়িয়ে এতখানি চলে আসতে পেরেছেন সেজন্যে অতর্কিতে পেছন থেকে খাবেন দরোয়ানের হাতে অর্ধচন্দ্র—হারাণবাবু কথাটা শেষ করলেন। এরপর আর কিছু বর্ণনা দিতে যাওয়া আমার পক্ষে নিরর্থক।

ছাতের আলসেয় হেলান দিয়ে আমার স্ত্রী বললেন, অতখানি জায়গা পুকুর বাগান একটা লোকের, আর আমরা মাথা গোঁজার জন্যে—বাকীটুকু দীর্ঘশ্বাস।

একটু নীরবতা। আবার হাওয়া বইল : সে লোকটা কেমন, এ কি তার পয়সার বিলাস না আর কোন উদ্দেশ্য আছে! বাকীটুকু চোখের চাহনিতে প্রকাশ পেল। বড়বাবুকে ঘিরে আমাদের অন্তহীন কৌতূহল, অজস্র জিজ্ঞাসা জমে উঠেছে।

* * *

সেদিন আমার নিদ্রাটি সবে গাঢ় হয়েছে আমার স্ত্রী দারুণ উত্তেজনায় একেবারে ভেঙে পড়লেন : ওঠো, ওঠো শিগ্‌গির, একটা কাণ্ড হচ্ছে—

রাত তখন গভীর। বারোটা তো বটেই। অবশ্য ঘড়ি দেখিনি। দেখেছি প্রায় পূর্ণিমার চাঁদ শিয়রে আসি আসি করছে। চতুর্দিক জ্যোৎস্নার উদ্দাম বন্যায় ভেসে যাচ্ছে।

শিয়রে চাঁদ দেখেছি। অর্থাৎ স্ত্রীর পেছু পেছু উঠে সেই ছোট্ট ছাদের আলসেয় গা ঢেলে দিয়েছি। তাছাড়া দোতলার ঘর থেকে বড় জোর পাঁচিলের কার্ণিশ দেখা যায়, তার বেশি নয়। তার মানে আমার স্ত্রী এত রাতে ছাদে উঠে দেখে গেছেন!

—অ্যাদ্দিন পরে সন্ধ্যেবেলায় দেখি ঘরখানায় আলো জ্বলছে আমার স্ত্রী ভাঙলেন সব, আমি আর থাকতে পারিনি গো—ওই যে—ওই দেখ—

দেখলুম। অভিভূত হয়ে দেখলুম। লতাকুঞ্জের মাঝখানে এক দীর্ঘকায় সবল পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর শুভ্র পাঞ্জাবীর ওপর জ্যোৎস্না যেন ঢলে পড়ছে, তিনি ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে অল্প মুখ তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

—ভাখো—ভাখো—ওই যে—ওই যে—উত্তেজনার যন্ত্রণায় আমার স্ত্রী যেন ফেটেপড়লেন। আমি এক ঝটকায় তাঁকে আলসে থেকে সরিয়ে নিয়ে এলুম। আমি কাঁপছিলুম। আমার স্ত্রীকে অত্যন্ত নিকটে টেনে নিলুম আমি।

মনে হোল এই মুহূর্ত অসহ। দীর্ঘদেহ পুরুষটি এখনো এই মুহূর্তগুলি ব্যেপে স্থির অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন, তাঁর সম্মুখে ওই আশ্চর্য সুন্দর কোমল নারীদেহের আশ্চর্য এক প্রতিমূর্তি—কিন্তু সে কোনো শিল্পীর অতুলনীয় ভাস্কর্যসৃষ্টি নয়, সে জীবন্ত, প্রাণবন্ত, কিন্তু পাথরের মত স্থির, তার সমস্ত দেহের ওপর চাঁদের সমস্ত জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে। মনে হোল এই মুহূর্তে আমি আত্মহত্যা করতে পারি, লাফিয়ে পড়ে বিক্ষত হতে পারি কাঁটা তারের বেড়ায়. এক অসহ্য যন্ত্রণা এবং ততোধিক আনন্দ আমি অনুভব করলুম। আমার সম্মুখে সবকিছু যেন আলোর আলো হয়ে গেল। আমি আর কিছু দেখতে পেলুম না।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে শিথিল দৃষ্টিতে দেখলুম এক সুবেশা নারী আলোনেভা ঘরের দিকে ফিরে চলেছে আর পুরুষটি যেন ক্লান্ত হয়ে তার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে।

ঠিক ক্লান্ত নয়, অসুস্থ।

হারাণবাবুকে তার কয়েকদিন পরে ওই একটি কথাই কেবল জিজ্ঞাসা করেছিলুম : আপনাদের বড়বাবু কি অসুস্থ ?

হাত দুটো চেপে ধরলেন তিনি : কি করে জানলেন আপনি ? কাক পক্ষীও যা এখনো টের পায়নি ! আমরা—অফিসের লোকেরা সবেমাত্র আঁচ করছি। বলুন, বলতেই হবে, কি করে জানলেন আপনি, দেখছেন, আমার অনুমান সত্যি, আমি ঠিক ধরিছি. বেশ, আপনি না বলেন ক্ষতি নেই, আমার এখন বোধ হচ্ছে আমি যেটা বুঝিছি সেটা একেবারে ফেলবার নয়।

তিনি যে কি বুঝেছেন তার একবর্ণও আমি এতাবৎকাল ধরে যেমন বুঝতে পারিনি আজও পারলুম না। মাঝ থেকে হোল কি বেপাড়ায় এসে যে এক এবং অদ্বিতীয় বন্ধুটিকে পেয়েছিলুম তাকে হারালুম। অর্থাৎ হারাণদা যেন কেমন হয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়, ঐ পর্যন্ত, আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেন না। তাঁর কাছ থেকে শুধু এইটুকু খবর পাই বড়কর্তার খুব অসুখ চলেছে।

একদিন বললেন, বড়বাবুর অসুখটা লিভারের, লিভার পচে গেছে, অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফল।

খুব উৎফুল্ল দেখাল হারাণ বাবুকে : তবে বেঁচে যাবেন, ডাক্তার বলেছে, বিশেষ ভয় নেই, কিন্তু অসুখের কারণ হচ্ছে ওই ? আমার অনুমান সত্যি, একেবারে সত্যি।

আর একদিন খুব বিমর্ষ দেখাল তাঁকে, বললেন, না মশায়, এলগিন রোডের সাহেবি হাসপাতালে আর হোল না, ডাক্তার রোগ ধরতে পারেনি, আজ ওনাকে পার্ক সার্কাসের নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হোল, অসুখটা নাকি পেটে জল জমছে। তাহলেও আমার কথাটা—

এ অঞ্চলের সর্বত্র কথাটা রটে গেল, অসুখ, বড়বাবুর অসুখ, খুব ভারী অসুখ, বাঁচে কি বাঁচেনা তার ঠিক নেই। অনেকে তাঁকে দেখতে যাচ্ছে। পার্ক সার্কাস এখান থেকে বেশ দূর, অনেক সময় আর পয়সা লাগে। তবু লোকে যাচ্ছে। বহু মানুষকে তিনি বহুভাবে সাহায্য করেছেন, জীবনে বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন তিনি, অনেকেই স্মরণ করছে তাঁর মিশুক স্বভাবের কথা, তাঁর মার্জিত আচরণ আর সহৃদয় ব্যবহারের কথা।

আমি একদিন হারাণবাবুকে কথাটা বলতেই তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন পড়েনিলেন, তারপর বললেন, বেশ, আগামীকাল রেডি হয়ে থাকবেন। ভিজিটিং আওয়াসে'র মধ্যে যেতে হবে কি না।

আমার স্ত্রীর মুখের রেখাগুলো সন্দেহ কুটিল হয়ে উঠল : তুমি যাবে ? নার্সিং হোমে ? কেন ?

তারপরই তিনি কথায় ভেঙে পড়লেন : আমি দেখছি সেদিনের পর থেকে তুমি কি রকম উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হয়ে পড়ছো।

আমি একটা কিছু বলার আগেই তাঁর করুণ অনুনয় শুনতে পেলুম : বলো, আমাকে তুমি কথা দাও, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না·········

*   *   *

হারাণ বাবু বললেন, আসুন, জুতো পরেই আসুন।

দশ নম্বর বেডের রোগীকে দেখেই আমি চমকে দু'পা পিছিয়ে এলুম। এ কাকে দেখছি আমি! কোথায় গেল সেই দীর্ঘ শালপ্রাংশু চেহারা! এ যে একটা ছোট ছেলে রোগা ছেলে একটা কালিপড়া ছেলে বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে।

—কে? হারাণ এসেছ? তোমার ক্লাবের চাঁদাটা ভাই দিতে পারিনি, আর তো চেকে সই করতে পারিনা, তুমি ভাই—একটা মিন্‌মিনে গলা কথা বলতে বলতে থেমে গেল, দু' চোখের কাজলকালো প্রান্ত দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

—বড়বাবু! কাঁদবেন না, কথা কইবেন না, কষ্ট হবে, আপনি নিশ্চয় ভালো হয়ে উঠবেন, গরীবের অনেক উপকার করেছেন, তাদের কথা কি ভগবান শোনেন নি!

হারাণবাবু খুব নীচু হয়ে বড়বাবুর চোখের জলটা মুছিয়ে দিলেন। আমি আর সহ্য করতে পারলুম না, আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

*   *   *

কয়েকদিন পরে হারাণ বাবুকে দেখলুম আরো বিষণ্ণ, নতমুখ। যুবক সঙ্ঘের ছোট্ট ঘরটির একপাশে বসে আছেন।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন আছেন কর্তা?

স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে হারাণবাবু মুখ তুললেন : তিনি মারা গেছেন।

আমার বুকের ভেতর একটা জিজ্ঞাসা ঠেলে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল, সব কথা তাঁকে খুলে বলি, যা দেখেছি তার সব কথা, দেখে আমার মনে যে কামনার আগুন জ্বলে উঠেছে তার কথা, আমার মনে হোল মৃত্যুশোকাতুর মানুষের সামনে মন খুলে সব কথা বলা যায়, এই জগৎ এই জীবন সম্বন্ধে এমন একটা নির্লিপ্ত দৃষ্টি আসে তার যে কোন সত্য কথনেই কোন সঙ্কোচ থাকে না তখন।

কিন্তু ঠিক তখনি সুযোগ করে উঠতে পারলুম না, না পারলুম আমার জিজ্ঞাসার বোঝা নামিয়ে দিতে না মনের কথা প্রকাশ করে বলতে।

বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে জানিয়ে রাখলুম : যদি দেখ গভীর রাতে আমি ঘরে নেই, জানবে ছাদে গেছি।

স্ত্রী শুধোলেন, তোমার কি হোল গো?

আর কি হবে! মনের বোঝা নামাতে পারছি কই! আমি বেশ বুঝছি বড়কর্তার মৃত্যুর পেছনে একটা রহস্য আছে আর সে রহস্য জানেন একমাত্র ঐ হারাণ বাবু। আমি কবে তাঁকে নির্জনে পাব!

সেদিন অনেক রাত অবধি আমি বসে রইলুম। একে একে ছেলেরা চলে গেল, যুবক সঙ্ঘে কেবল রইলেন ওই এক কোণে হারাণবাবু, আর এই কোণে আমি।

হারাণবাবু ওঠবার উদ্যোগ করছিলেন, আমি সরে এসে বললুম, একটু কথা আছে, আপনি সেদিন যে বলছিলেন, সব জেনে গেছি, কি জেনেছেন আপনি? কি সে রহস্য?

আমি 'রহস্য' কথাটার ওপর জোর দিলুম, অনেক দিন থেকেই আমি তাঁর কথায় মৃত্যুর সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছিলুম।

তিনি বিষণ্ণ হাসি হাসলেন, তাঁর ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল : আপনি কি বুঝতে চাইবেন আমার কথা।

তারপর কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, আমি যেদিন প্রথম জানতে পারলাম, যেদিন আমার পিগ আয়রণের ষ্টক মিলল না, মাল সর্ট পড়ল, যেদিন লোহার কোটা-পারমিটের হিসেবে গরমিল হোল, পারমিট উধাও হোল, আমি সেদিন বুঝেছিলাম—তখন একদিন করলাম কি জানেন—

একবার আমার দিকে তাকিয়েই চুপ হয়ে গেলেন হারাণবাবু, অনেক পরে ধীরে ধীরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন: বড়বাবুর কামরায় ঢুকলাম, একথা সেকথার মধ্যে বলেই ফেললাম, জানেন ক্যান্সার রোগটার কারণ? তিনি আমার কথা আদৌ বুঝতে না পেরে মুখ তুললেন। আমার মধ্যে কে যেন সাহস যুগিয়ে দিলে, বলেই ফেললাম, দেখুন বড়বাবু, ক্যান্সার রোগের কারণ হচ্ছে দেহের ভেতরকার সামঞ্জস্য হারিয়ে কতকগুলো সেল হঠাৎ ওভার অ্যাকটিভ মানে অতিশয় সক্রিয় হয়ে ওঠে, ফলে সেখানে দেখা দেয় ক্যান্সার, এ ব্যাধি ভালো হবার নয়, এর কবলে তলিয়ে যায় গোটা শরীর।

—বড়বাবু আমার ইঙ্গিত ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু কিছুই বলেন নি, শুধু গম্ভীর হয়ে গিছলেন, হারাণবাবু থামলেন।

আমি সবিনয়ে বললুম, আর একটু যদি বুঝিয়ে বলেন—

—কি আর বলব বলুন তো, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, এ হোল সমাজদেহের কথা, এক জায়গায় ক্যান্সারের ক্ষত, কতকগুলো মানুষ ওভার অ্যাকটিভ হয়ে উঠেছে, আস্তে আস্তে দেহটা পচে যাচ্ছে। আর তাঁর নিজের মৃত্যু, সে বড় করুণ, বড় দুঃখের সেই আত্মহত্যা—

—আত্মহত্যা করেছেন বড়বাবু? আমি চমকে উঠলুম, কই শুনিনি তো।

—হ্যাঁ আত্মহত্যা, হারাণবাবুর ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল, তিনি যে কালোবাজার চোরাবাজার করেছেন তার মানে কি? তার মানে হোল তিনি গোটা সমাজের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন, তার সমাজসম্বন্ধ বিনষ্ট হয়ে গিছল, তিনি সমাজের ভালোমন্দ থেকে নিজের ভালোমন্দকে আলাদা করে দেখেছিলেন, ফলে ভেতরে ভেতরে হয়ে পড়েছিলেন অসামাজিক, মানুষকে আর মনের ভেতরে টানতে পারেন নি, নিজের ভেতরে এসেছিল নির্জনতা, তখন নিজের স্বরূপ যাতে না দেখতে হয় তাই নিজেকে চেয়েছিলেন ভোলাতে, ধরেছিলেন মদ, এসেছিল তার আনুষঙ্গিক, অথচ ব্যাপার কি জানেন—হারাণবাবু যেন দুঃখে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন—তাঁর ভেতরে ছিল সমাজসত্তা, সেটা তাকে অহরহ আহত করছিল, আর সেইজন্যই তিনি চান-খাওয়া ছেড়ে কাজের পেছনে ছুটেছিলেন, আসলে তিনি চাইছিলেন আত্মহত্যা করতে—

চোখের কোণ দুটো চিক্‌চিক্ করে উঠল, হারাণবাবু মাথা নীচু করলেন।

আমি ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে এলুম।

বাড়ীতে পা না দিতেই স্ত্রী চেপে ধরলেন, কোথায় ছিলে এত রাত অবধি? বল কোথায় ছিলে, নইলে ওই জলে ডুবে মরব আমি।

আমি শুধু ক্লান্ত কণ্ঠে বললুম, সন্ধ্যের পর ছাদের সিঁড়িটায় একটা তালা লাগিয়ে দিও।

উপন্যাস।

ঘুম ভেঙে যায় রাতে। একটা ভারী জিনিষ ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাই। তার পরই চোখের ওপর ফুটে ওঠে একটা ছবি। দীর্ঘদেহী একটি মানুষ ফরেষ্ট হস্পিটাল থেকে বেরিয়ে আসছেন। হাতে একটি ল্যাম্প। এদিক ওদিক কি যেন খুঁজে ফিরছেন।

হঠাৎ আলোটা নিভে যায়। শনি-চা-রি-য়া…। একটা আর্ত্ত চীৎকার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে। সারজম গাছের ওপর থেকে পাখা ঝাপটে উড়ে যায় বনমোরগ আর সারোময়নার দল।

এরপর কতক্ষণ স্তব্ধতা। কান পাতলে শোনা যায় দু' চারটে কথা। টুকরো টুকরো, কতক বা অস্পষ্ট।

আমি মরতে চাইনি ডাক্তার। [অতি ক্ষীণ আহত একটা গলার আওয়াজ।]

তবে কেন এমন করলে?

তোমাকে খু-উ-ব ভাল লাগে, তাই।

এ বনের থেকে তোমাকে মুক্ত করে আমার দেশে নিয়ে যাব মনে করেছিলাম শনিচারিয়া।

তোমার দেশে। [কথা অস্পষ্ট। একটা যন্ত্রণার কাতরোক্তি বলে মনে হয়।]

সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি বিয়ে করতাম।

তোমার ধর্মকে আমি মেনে নিলাম ডাক্তার। কথা দাও, আমার ধর্মকে তুমি ঘৃণা করবেনা।

কথা দিচ্ছি শনিচারিয়া।

এরপর সীমাহীন নীরবতা। পাহাড়ের আড়াল থেকে অতি উজ্জল নীলাভ একটি দ্যুতি ফুটে উঠছে। চন্দ্রোদয় হয়েছে পাহাড়ের ওপারে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এ পারের ছবি।

নতজানু হয়ে বসে আছেন ডাক্তার জনসন প্রার্থনার ভঙ্গীতে। সামনে নিস্পন্দ শুয়ে আছে আদিবাসী এক কন্যা। যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে।

* * *

আপনারা যদি কেউ কখনো সিংভূমের সারান্দা ফরেষ্টে আসেন তাহলে আমার মত এমনি বিচিত্র এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন কিছুকাল। সাতশোটি পাহাড় সারান্দা নাম নিয়ে সবুজ অরণ্যের পোষাক পরে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে উত্তর পূর্বে চলে গেছে। আপনি পাহাড়ী রাস্তা ধরে এগিয়ে আসবেন। একদিকে উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে পাহাড়ী খাদ। তারমাঝে অপ্রশস্ত পথ। পাহাড়ের গায়ে আদিম অরণ্য। শাল, হেসেল, বীজা, শিমূলের ঘন বসতি। অজস্র লতাগুল্মে রহস্যময় বলে মনে হবে আপনার সারান্দা বনভূমি। কুইনা রেঞ্জ ধরে চলে আসুন। কিছুদুর এগিয়ে সামনে দেখবেন একটি পাহাড়ী নদী। ভারী মিষ্টি তার নাম। কোয়েল নামের সত্যি একটা যাদু আছে। নুড়ির নূপুর বাজিয়ে কোয়েল একখানা নীল শাড়ি গায়ে পাক দিয়ে জড়াতে জড়াতে ছুটে চলেছে।

নদী পেরিয়ে চলতে চলতে আপনি একসময় এসে পড়বেন 'ছোট নাগরা' নামে একটি পাহাড় ঘেরা আদিবাসী গ্রামের মাঝখানে। দূর থেকে দেখতে পাবেন আদিবাসী 'হো'দের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। লাল-কাল মাটির প্রলেপ লাগানো দেয়াল। ঐ পাহাড়ী গ্রামটিতে ঘুরতে ঘুরতে আপনি কয়েকটি চিহ্ন দেখতে পাবেন। পাথর-গড়া মন্দির আর ইঁটের তৈরী ভাঙা গড়ের ধ্বংস স্তূপ। বনের মাঝে এ ধরণের চিহ্নগুলি সত্যিই আপনাকে অবাক করবে। আপনি ভাবতে ভাবতে

গ্রামটি পেরিয়ে আসবেন। কিছুদূর বনের পথে এগিয়ে এসে বাঁক ফিরলেই আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটি পরিচ্ছন্ন শাল মহুয়ার ঘেরা আস্তানা। বেশ-খানিকটা জমি নিয়ে চমৎকার গাছপালা, লতায় ফুলে সাজানো জায়গাটি আপনাকে আকর্ষণ করবে বিশেষভাবে। আপনি পথ থেকে একটু উঠে এলেই দেখতে পাবেন কয়েকটি বাংলো টাইপের খড়ো ঘর। তাদের একটির ওপরে কাঠের সাদা রঙ করা ক্রুশ আপনার চোখে পড়বে। এই নিভৃত বনভূমিতে আপনি ক্রুশচিহ্ন দেখে যখন মনে মনে চিন্তা করবেন, কি করে এখানে এল খৃষ্টধর্ম, ঠিক তখনি হয়ত আপনার চোখে পড়বে আর একটি বিচিত্র বস্তু। চার্চের সামনেই বিভিন্ন রকমের কয়েকটি গাছ একত্রে জড়াজড়ি করে উঠেছে। তাদের তলদেশে অতি পরিচ্ছন্ন একটি বাঁধান বেদী। সেখানে বিচিত্র সব আঁকিবুকি কাটা। পশুপাখি বলির রক্ত চিহ্ন ও আপনার চোখে পড়বে। আপনি যদি 'হো'দের দেবতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হন তাহলে বুঝতে একটুও দেরী হবেনা যে এটি বন দেবতা 'জায়েরা'র আস্তানা। আপনি নিশ্চয়ই এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাবেন। একই সঙ্গে চার্চের এলাকায় এ ধরণের আদিবাসী দেবতার আস্তানা কি করে থাকতে পারে এই নিয়ে যখন আপনি জটিল চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়বেন, ঠিক সেই সময় আপনি এক অতি বৃদ্ধ পাদ্রীর দেখা পেতে পারেন।

তাঁর তুষারশুভ্র কেশ আর মুখের মৃদু হাসিটি আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

আপনি এগিয়ে গিয়ে এই ধর্মরহস্য সম্বন্ধে তাঁর কাছে কিছু জানতে চাইবেন। তিনি তেমনি মৃদু হেসে আপনার হাত ধরে নিয়ে যাবেন চার্চের ভেতরে। তারপর আপনার হাতে একখানি অতি জীর্ণ পুঁথি তুলে দিয়ে ইঙ্গিতে পড়তে বলবেন। আপনি বৃদ্ধ পাদ্রীর নির্দেশে বাইরে এসে বাঁধান বেদীর ওপর বসে একের পর এক পাতা উল্টে যাবেন। অজ্ঞাত অরণ্য মানুষের অলিখিত এক ইতিহাস ফুটে উঠবে আপনার চোখের ওপর। ডাক্তার জনসনের ডায়েরী থেকে আপনি মধুর আদিম অরণ্যের বিচিত্র অনাস্বাদিত এক রহস্যের সন্ধান পাবেন।

* * *

ডাক্তার জনসনের ডায়েরী—

উৎসর্গ: যে প্রেম আমাকে ধর্ম বিশ্বাসে উদারতা শিখিয়েছে সে প্রেমকে নত হয়ে নমস্কার করি। যে কুমারী আমাকে সেই প্রেম দান করেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করি আমার এই স্মৃতিগ্রন্থখানি।

২০শে জুন: ১৮৯৮

জামদা থেকে হাডসনের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আসতে বেশ লাগল। এখানে ওখানে পাহাড়গুলো ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে সমতল। কোথাও বা দু'চারটে জলের ধারা চোখে পড়ে। বাংলাদেশে মেয়েদের কপালে লালরঙের যে পদার্থটি দেখেছি এখানে জলের রঙ কতকটা সেই রকম। হাডসন বললেন, এখানকার পাথরে নাকি প্রচুর লোহা আছে।

পথের মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভালই হল। যেভাবে রোদ চড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ভেতর এতটা পথ আসা সত্যিই কষ্টকর হত। যীশুকে ধন্যবাদ, মেঘ করে বৃষ্টি এল। পাহাড়ের ওপর যখন মেঘ জমে উঠছিল তখন আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম সেদিকে। ছোট একটুকরো মেঘ দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের ভেতর পাহাড়ের কোল বেয়ে নামতে লাগল সে মেঘ। গুরু-দেহ পাখি যেমন পায়ের উপর ভর রেখে কিছুটা দৌড়ে এসে আকাশে ডানা মেলে দেয়, ঠিক তেমনি পাহাড়ের কোল বেয়ে খানিকটা নেমে এসেই মেঘটা যেন পাখা ঝাপটে উড়ে আসতে লাগল। শোঁ শোঁ শব্দ উঠল। হাডসন ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। আমাকেও নামতে বললেন। পথের পাশে কয়েকটা শালের গাছ জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। আমরা তার আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘোড়া দুটোকে সেই গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম।

মুক্তোর দানার মত এক সময় বৃষ্টি ঝরতে লাগল

প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তারপর অঝোর ধারায়। যেদিক থেকে বাতাস বইছিল আমরা তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়েছিলাম। ইচ্ছে করছিল, একটু জলে ভিজি। হাডসনকে ইচ্ছের কথাটা জানালাম। হাডসন হেসে বললেন, ডাক্তার, চিকিৎসার গোড়ার কথা হল প্রকৃতি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানা। তারপর ওষুধের কথা।

বললাম, তা মানি, কিন্তু একথা কেন?

এই যে তুমি চাইলে বৃষ্টিতে ভিজতে। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দিগর্মীতে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। যে দেশে ডাক্তারী করবে, সে দেশের আবহাওয়ার খোঁজ খবর রাখতে হয়।

কথাটা ভালই লাগল। বয়েসের একটা অভিজ্ঞতা আছে। ডাক্তার হলেও আমি তরুণ; হাডসন ফরেষ্ট রেঞ্জার হলেও অনেক প্রবীণ। পুঁথিপড়া শিক্ষার চেয়ে অভিজ্ঞতার দাম অনেক বেশী।

আমরা নিজেদের বৃষ্টির ছোঁয়া থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সবটুকু পারলাম না। এলোমেলো বাতাসে কিছুটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। এদিকে শালের বড় বড় পাতার থেকে ভারী ভারী জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল আমাদের মাথা আর পোষাকের উপর।

বৃষ্টি থামলে শান্ত হল প্রকৃতি। গরম অনেক কম বলে মনে হল! আমরা আবার ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম।

বনের ভেতর ঢুকে মনে হল, দিনের বেলাতেই সূর্য ডুবেছে। হাডসন সামনে চলেছেন, আমি আছি পেছনে। পথের অন্ধিসন্ধি হাডসনের নখদর্পণে। তবু চারিদিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন তিনি। আমার কিন্তু চারদিকের গাছপালা, লতাপাতার নিবিড়তা মনোরম মনে হচ্ছিল।

হাডসন ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন! ইঙ্গিতে আমাকে থামতে বললেন। তারপর হাতের ইসারায় যে দৃশ্য দেখালেন তা কোনদিনে ভোলার নয়।

একটি একশিলা পাথরের ওপর মেঘের ছায়া এসে পড়েছে। লতায় পাতায় ফুলে জায়গাটি মনোরম। পাশের পাহাড় থেকে ঝির ঝির শব্দে ঝরে পড়ছে একটা ক্ষীণাঙ্গী ঝরণা। ঐ একশিলা পাথরের ওপর পাখা মেলে নাচছে একটি ময়ূর। পাখায় কি উজ্জ্বল রঙের বাহার। কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মেঘভাঙা রোদের দু'এক টুকরো রশ্মি ইতিমধ্যে এসে পড়েছে ওর চিত্রিত পাখার ওপর। আবার চোখে পড়ল আর একটি ময়ূর। একটা মহুয়া গাছের ডালে সে বসেছিল! এবার দ্বৈত নৃত্য শুরু হল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতে লাগলাম। বনের নটনটী নেচে চলেছে আপন মনে! দর্শকের দিকে তাদের ভ্রুক্ষেপও নেই। মানুষের তৈরী করা রঙ্গমঞ্চে যে নৃত্য শিল্পীরা নাচে, তারা কি এমন করে দর্শকদের ভুলে আপনার ভেতর ডুবে থাকতে পারে।

১৫ই সেপ্টেম্বর:

কয়েকমাস যেন বৃষ্টিতে ভেসে গেল পাহাড়ী দেশটা। কুমড়ির বাংলোতে প্রায় বসে বসেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। বর্ষার দিনে পাহাড়ে ধ্বস নেমে পথ দুর্গম করে দিয়েছে। তার ওপর দিয়ে পথ করে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

আমাদের বাংলোর দেয়াল, মেঝে সব কাঠের। ছাউনিটা খড়ের। চাল বেয়ে টপটপ করে যখন বৃষ্টির জল পড়ে তখন জলের রঙটা দেখি লাল। সামনে একটা চেয়ার ফেলে সারাদিন আমি বসে থাকি। বাংলোর চারদিকে কাঠের খুঁটির বেড়া। সেই খুঁটিগুলো আর দেখা যায় না। কত রকমের লতা, পাতা, ফুলে তাদের ছেয়ে ফেলেছে। বাংলোর কর্মচারীদের কাছ থেকে কয়েক রকমের ফুল আর লতার নাম শিখে নিয়েছি। একটি লতার নাম 'জনাপা'। গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুনী আর সাদা ফুলে ভরে আছে। বনমল্লী, যুঁই আরও কত ফুল। মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। পাশেই কারো নদী। মাঝে মাঝে বান ডাকে। শোঁ শোঁ শব্দ উঠলেই আমি বাংলো থেকে বেড়িয়ে নদীর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ওপরের পাহাড়ে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই বৃষ্টির ঢল নেমে আসছে নদী বেয়ে। তার আওয়াজ ভেসে আসে বহু দূরের থেকে।

নদীতে দেখা যাচ্ছে নীল জলের প্রবাহ, পরক্ষণেই কত

উঁচু একটা গৈরিক জলের ঢেউ তার ওপর এসে পড়ল। অমনি কূল ছাপিয়ে বইল জলের ধারা।

মাঝে মাঝে কুলিকামিন নিয়ে হাডসন পথের অবস্থা দেখতে বেরিয়ে যান। কখনো বা তাঁর বাংলোতে ফিরে আসার আগেই প্রবল বর্ষা শুরু হয়। মেঘের মাতামাতি চলতে থাকে। বাজের গর্জনের সঙ্গে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা যায়। আশপাশের পাহাড়গুলো সে শব্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাডসনের জন্যে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ি। বড় জেদী আর একরোখা মানুষ এই হাডসন। বিপদের ঝুঁকি যতটা নেওয়া চলে তার চেয়ে অনেক বেশী নিতে পারেন তিনি। তাই মাঝে মাঝে তাঁর জন্যে চিন্তিত না হয়ে উপায় থাকে না। হাডসন আমার পিতৃব্যের বন্ধু। তাঁর ভরসাতেই আমার এখানে আসা। কুলিকামিনেরা পাহাড়ী রাস্তাঘাট তৈরী করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। মাঝে মাঝে জ্বরজাড়িতে ভোগে। তাদের জন্যে সরকারী রিজার্ভ ফরেষ্টে চিকিৎসকের দরকার। নতুন জায়গা দেখার একটা লোভ ছিল আমার। তাই হাডসনের ডাকে চলে এলাম।

এই বর্ষার ভেতর দু'একদিন হাডসনের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। বৃষ্টি বন্ধ থাকলেও পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘ থমকে থাকত। তারই ফাঁকে সূর্যের আলো এদিক ওদিক একটু দেখা দিলেই পাখিরা ঝাঁক বেঁধে রদ্দুরের লোভে জড় হত। নিপুণ শিকারী হাডসনের অব্যর্থ লক্ষ্য। কয়েক জোড়া বন মোরগ, তিতির শিকার করে বুনো লতায় বেঁধে নিয়ে আমরা বাংলোয় ফিরতাম।

রাতে বৃষ্টি নামত। আমাদের বাংলোটা সেই মুহূর্তে মনে হত যেন সমস্ত জগতের থেকে বিছিন্ন হয়ে গেছে। বিশাল সমুদ্রের বুকে একটি নিঃসঙ্গ তরণীতে আমারা দুটি প্রাণী কোথাও ভেসে চলেছি বলে মনে হত।

হাডসন যেমন শিকারী তেমনি ভোজনবিলাসী। এখানকার বাবুর্চির রান্না তাঁর আদপেই পছন্দ হয়না। রাতে বসে বসে হাডসন তাঁর সংসারের কথা তুলতেন। আগামী শরৎকালে সমস্ত পরিবারকে এনে ফেলার একটা পরিকল্পনাও তিনি এই সময় স্থির করে ফেললেন।

১৭ই নভেম্বর :

একদিন দেখলাম হাডসন আর বাংলো থেকে কাজে বেরুলেন না।

বললাম, কি হল, শরীর খারাপ নাকি?

হাডসন কোন কথা না বলে আমার হাতে একখানা চিঠি দিলেন।

চিঠিখানা এসেছে বোম্বে থেকে। হাডসনের এক বন্ধু সেই চিঠির রচয়িতা। সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তিনি। চিঠির মোটামুটি বক্তব্য এই, সরকার একদল মিশনারীকে সারান্দা ফরেষ্টে পাঠাচ্ছেন আদিবাসীদের ভেতর খৃষ্টধর্মের প্রচারের জন্য। এ কাজে দু'দিক থেকেই লাভ হবে। অখৃষ্টানেরা প্রভু যীশুর মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে। তা ছাড়া পরোক্ষে আর একটি বড় রকমের লাভের সম্ভাবনা আছে। সেটি হল, খৃষ্টধর্মের প্রভাবে এলে আদিবাসীদের ভেতর কথায় কথায় বিদ্রোহ করবার আগ্রহ কমে আসবে! তখন সরকারের পক্ষে বনভূমিতে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করা আর ব্যবসা চালানোর সুবিধে হবে।

বললাম, এতে তো আপনারই সুবিধে। আদিবাসীরা আপনাকে কুলিকামিন দিয়ে এখন সাহায্য করতে চাইছেনা, তখন আর এ হাঙ্গামা থাকবেনা।

হাডসন বললেন, চিঠির শেষ অংশটুকু পড়ে দেখ।

চিঠি শেষ করে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, কি আনন্দ, আপনার পরিবারের সবাই দেখছি ঐ দলের সঙ্গেই আসছেন!

হাডসন এবার উঠে বসলেন। এমন উত্তেজিত মুখভাব আমি এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না।

বললেন, পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছে দেখতে পাচ্ছ না?

ওঁর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে আমি বোকার মত তাকিয়ে রইলাম।

হাডসনের মুখে করুন হাসির রেখা ফুটে উঠল। মুহূর্তে হাডসন শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়লেন, জনসন, এ একান্ত আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা। অন্য কারু জানার কথা নয়।

এমন বলিষ্ঠ মানুষের এমনি কোমল একটা আঘাতের জায়গা থাকতে পারে তা আগে কোনদিন ভাবতে পারিনি!

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা।

হাডসন বললেন, তুমি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট ডাক্তার, তবু এই নির্জন জায়গায় একই সঙ্গে আমরা কাটাচ্ছি, তাই তুমি আমার বন্ধু। তোমার কাছে গোপন করার কিছু নেই আমার।

মনের কোন একটি গোপন কথা হাডসন আমাকে আজ শোনাতে চান, তাই এ ভূমিকা।

হাডসন বললেন, আমার স্ত্রী তাঁর কুমারী জীবনে পিটারের প্রতি আসক্তা ছিলেন। আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হলে পিটার অবিবাহিত থেকে যান, পরে মিশনে যোগ দেন।

হাডসনের ব্যথার কাঁটা কোথায় বিঁধে আছে এতক্ষণে তা বুঝলাম।

সান্ত্বনা দেবার ত্রুটি রাখলাম না। বললাম, কুমারী জীবন আর বিবাহিত জীবনের ভাবনা এক হবে এমন কোন কথা নেই। আজ উনি পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছেন বলে আমরা নিশ্চিত ধরে নিতে পারিনা যে ওঁর মনে এখনও কুমারী জীবনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হাডসন হেসে বললেন, যুক্তি মনকে অনেক সময় প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মন প্রায় ক্ষেত্রেই তাকে স্বীকার করতে চায় না।

বললাম, কোন সন্দেহ থাকলে আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ নিতে পারতেন!

করুণ হাসি হাসলেন হাডসন। বললেন, একবার এক হিন্দুসাধুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছিল। সাধু আমাকে বললেন, যে বাতাস আমাদের নৌকো ডুবায়, জলের ভেতর ডুবে যেতে যেতে আমরা সেই বাতাসকেই প্রতি মুহূর্তে চাই।

কথাটা মনে রাখার মত।

হাডসন বললেন, আমাদের যা পারা উচিত, বা পারা দরকার ছিল, তা সব সময় পারা যায় না। যে আমাদের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটায়, অনেক সময় আমাদের মন তাকেই বেশী করে আগলে রাখতে চায়।

আমি চুপ করে গেলাম। জীবনের রহস্য সত্যিই বিচিত্র।

ইতিমধ্যে মিসেস হাডসন এসে পৌঁছলেন! সঙ্গে অবিবাহিতা বোন ডরোথি।

দু'জনের বয়েসে যেমন তফাৎ স্বভাবেও ঠিক তেমনি।

মিসেস হাডসন অত্যন্ত বাকপটু। রসিকতার সঙ্গে সামাজিকতার চমৎকার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। সারাক্ষণ কৌতুক আর হাসির টুকরো ছড়িয়ে চলেছেন।

তাঁর বাইরের এই উজ্জ্বলতার ভেতরে কোথাও যে মনের আকাশে মেঘ জমে থাকতে পারে তা একেবারেই ভাবা যায় না।

ডরোথির প্রকৃতি একটু চাপা। চেষ্টা করেও সে উজ্জ্বল হতে পারে না। স্বভাবের গভীরে কোথায় যেন তার একটা একান্ত নির্জন বসবাসের জায়গা আছে। সেখান থেকে তাকে কদাচিৎ বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

যে ক'দিন পাদ্রী পিটার বাংলোতে রইলেন, হাডসন অন্য মানুষ। চেনাই যায় না যে ভেতরে তাঁর কোন ক্ষত আছে।

আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রইল না। সকাল, সন্ধ্যা পিটারের সঙ্গে চলতে লাগল নানান পরিকল্পনা। স্থির হল, সাসাংদাতে একটি চার্চ তৈরী করে সেখান থেকেই ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে!

সাসাংদায় চার্চ তৈরী হল। কাঠের বাড়ী, খড়ের চাল। চার্চের লাগাও আরও কয়েকখানা ঘর উঠল। পাদ্রী পিটার আর তাঁর দলবল থাকবেন সেখানে। স্কুলের জন্যে জমি তৈরী করা হল।

আমরা সবাই মিলে ঘোড়ায় চড়ে চললাম সাসাংদার চার্চে। সারাদিন রইলাম সেখানে। প্রার্থনায় যোগ দিলাম। প্রথম দিনেই একটি আদিবাসী মেয়েকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হল। মেয়েটি আমাদের বাংলোতে পরিচারিকার কাজ করত। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ

হয়েছিল তার। দীক্ষা নিয়ে মেয়েটি মিশনারীদের কাছেই থেকে গেল।

প্রথমদিকে কাজকর্মের জন্যে তার সেখানে থাকা দরকার হয়ে পড়েছিল।

আমরা ফিরে এলাম বাংলোতে

২৫শে ডিসেম্বর :

বর্ষায় ভেঙে গিয়েছিল পথঘাট : শরৎকালে সব মেরামত হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কুম্‌ডির বাংলো থেকে খানিক দূরে খল্‌কোবাদে গড়ে উঠেছে আমার হাসপাতাল। রোগী অল্পই থাকে, আমাকে প্রায় একা একাই কাটাতে হয়। বসে বসে বই পড়ি। শিকার কাহিনী পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। পাদ্রী পিটার কয়েকখানা বই পাঠিয়েছেন। সবই প্রায় ধর্মগ্রন্থ। এত সহজ করে বইগুলির ভেতর ধর্মের কথা লেখা আছে, যা পড়লে সাধারণ মানুষও ধর্ম-পথের মোটামুটি একটা হদিস পেতে পারে।

হাসপাতালের সামনে একটি চমৎকার শালের বন। তলাকার পাথরগুলো বড় পরিচ্ছন্ন। আমি বসে বসে দেখি একটির পর একটি শালের পাতা খসে খসে পড়ছে। একটু হাওয়া লাগল, অমনি কি বিচিত্র শব্দ করে ওরা ঘুরতে ঘুরতে এক সময় দমকা হাওয়ায় ওরা নেমে গেল নিচের উপত্যকার ভেতর। রাতের আকাশ ঘন নীল। জ্বল জ্বল করে জ্বলছে একটা তারা শালগাছটার ঠিক মাথার ওপর। আরও অগুন্‌তি তারা আকাশে। সবার ভেতর এটি যেন একটু আলাদা।

কত কাছে, আর কত স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে। যীশুর আবির্ভাবের সময় পূর্বদেশের সাধুরা এমনি একটি নক্ষত্র আকাশে দেখেছিলেন।

শালগাছের মাথার ওপর ঐ তারাটি দেখলে আমার মন কেমন যেন শান্ত আর গভীর হয়ে আসে।

মনে হয়, আমার হাসপাতালে যে রোগীটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রাতে ঘুমুতে পারছেনা, তার ঐ তারার আলোর মত স্নিগ্ধ শান্তি আসুক। জগতের যেখানে যত রোগার্ত্ত, শোকার্ত্ত রয়েছে তারা সুস্থ হয়ে উঠুক, সুখী হোক্।

এই শীতের রাত্রি, কুয়াশার চাদর বিছান উপত্যকায় অতন্দ্র চাঁদের আলো, বনভূমির নিভৃতলোকে কীটপতঙ্গের বিচিত্র ধ্বনি আমাকে যেন আবিষ্ট করে রাখে।

৩০শে ডিসেম্বর :

কয়েকদিন আগে আমার হাসপাতালে একটি রোগী এসেছে, সে রাতে কিছুতেই ঘুমুতে পারছেনা। ঘুমের ওষুধ দিলে কিছু সময় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে, তারপর জেগে উঠলেই শুরু হয় গোঙানী। ওর জন্যে এ ক'দিন আমারও চোখে ঘুম নেই।

সেদিনটির স্মৃতি বোধকরি ভুলতে পারবনা কোনদিন।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম কুম্‌ডির বাংলোর দিকে। পথের ধারে দেখলাম কাঞ্চন ফুল ফুটেছে।

এ দেশের গাছপালা আর ফুলের কত নামই না আমার ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে।

একটা দুটো গাছ নয়, শত শত কাঞ্চন ফুলের গাছের যেন বন তৈরী হয়েছে। আমি ঘোড়ায় বসে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ আর ফেরাতে পারলাম না। কোন কোন গাছে সাদা সাদা ফুল ফুটেছে, আবার কোন গাছে বা ঈষৎ বেগুনী আভার ফুল। গাছ খুব বড় নয়, কিন্তু বড় শোভন সুন্দরভাবে ডালপালা পাতাপত্র মেলে রেখেছে।

আরও এগিয়ে চললাম। বেলা শেষের তখনও অনেক বাকী! শীতের বনভূমি এরই মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। প্রকৃতির কি বিচিত্র আয়োজন। টেকোমা ফুল ফুটে রয়েছে পথের ধারে। গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ রঙের ফুল। খাদের ধারে তিলাই গাছটার ছোট ছোট সাদা ফুলে তখনও মৌমাছিদের ভীড় ভাঙেনি! ওদিকে ডাইনে উঁচু পাহাড়ের গায়ে আরাবা গাছে বসে আছে এক ঝাঁক পাখি। বিচিত্র কলরব তুলেছে তারা।

ডালের ফাঁকে ফাঁকে লাল লাল ছোট ফুলগুলি উঁকি দিচ্ছে। শীতের প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে অতি ধীরে এগিয়ে চলেছি আমি, আর মনে মনে ঈশ্বরের অপূর্ব

সৃষ্টির তারিফ করছি। হঠাৎ আমার ঘোড়াটা থমকে দাঁড়াল। সামনে একটি টিলা। ঐ টিলার কোল ঘেঁষেই আমার পথ। পথটা ঐ পাহাড়টার কাছে এসে কোণ তৈরী করে বেঁকে গেছে। এপারের পথ থেকে ওপারের পথটা দেখা যায় না। ঘোড়াটা হঠাৎ থামল দেখে আমি চারদিক তাকাতে লাগলাম। হঠাৎ যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পাহাড়টা যেখানে দুটো পথের কোণ সৃষ্টি করেছে তার নিচেই সাদা সণ্টলিকের একটা রেখা অগভীর ভ্যালির মধ্যে নেমে গেছে। ঐ সণ্ট লিকের পথে উঠে আসছে একটা সম্বর। আর তার কয়েক হাত ব্যবধানে শাল আর হেসেল গাছের আড়ালে থেকে একটি চিতা গুঁড়ি মেরে সম্বরটাকে অনুসরণ করছে। সম্বর কিছু একটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে কিন্তু চিতাটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই লাফাতে লাফাতে সণ্টলিক ধরে ওপরের পাহাড়ের দিকে উঠে আসছে, আবার একটু থেমে সিধে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল। ঘোড়ায় চড়ে এই পাহাড়ী আঁকাবাঁকা খাদের পথে দৌড়ান সম্ভব নয়। তাতে যে শব্দ হবে চিতাটা সে শব্দে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আশেপাশে একটা গাছ খুঁজতে লাগলাম। ঐ টিলার পাশেই একটা উঁচু পলাশ গাছ ছিল। জুতো খুলে তার ওপর উঠলাম।

এখন টিলার দু'পাশে দুটো পথই আমি দেখতে পাচ্ছি। সম্বরটা লাফ দিয়ে এক ধাপ টিলার ওপর উঠে এল। চিতাটা এখন পথের পাশে একটা ঝোপের আড়ে গুঁড়ি মেরে বসেছে।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। দুটি গরু কতকগুলো কাঠের বোঝা টেনে টেনে আনছিল একটা পথ ধরে, তাদের ঠিক পেছনেই আদিবাসী একটা লোক গরুগুলোকে তাড়িয়ে আনছিল। আমি এই দৃশ্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। চীৎকার করে সাবধান করতে গেলে চিতাটার দৃষ্টি সম্বরের কাছ থেকে গরু আর আদিবাসীর ওপরে গিয়ে পড়বে। তখন বিপরীত ফল ফলবে।

আমি চুপচাপ প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে হরিণটা আর এক ধাপ লাফ দিয়ে ওপরের বনের কাছাকাছি গেলেই বাঘটা তাকে অনুসরণ করে ওপরে উঠে আসবে। তখন ঐ লোকটার বেঁচে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

কিন্তু সম্বর নড়ল না, বাঘটাও বসে রইল পথের ওপর। আর তাদের মাঝে এসে পড়ল গরুর গাড়ী আর আদিবাসী লোকটি। বাঘটাকে দেখে গরু দুটো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। লোকটা তখনও বাঘটাকে দেখতে পায়নি। সে গরুগুলোকে আয়ত্বে আনবে বলে হেঁই-হো হেঁই-হো করে তাদের পিছু পিছু দৌড়ে চলল। লোকটি যেই চিতার ধার ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে অমনি একটা থাবা এসে পড়ল তার ঘাড়ে। বলিষ্ঠ লোকটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমি গাছের ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠলাম। পাহাড়ে পাহাড়ে আমার সে চীৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

গাছের ওপর থেকে চেয়ে দেখি, বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে একবার আঘাত করে আবার খেলা করে, ঠিক তেমনি লোকটাকে নিয়ে বাঘটা খেলা করতে লাগল।

সূর্যাস্ত হয়ে গেল সামনের পাহাড়ের আড়ালে। পেছনের রাস্তায় একটা হৈ চৈ শুনে তাকিয়ে দেখি কতকগুলি আদিবাসী তীর ধনু নিয়ে মশাল জ্বেলে এদিকে দৌড়ে আসছে। আমি গাছের ওপর থেকে চীৎকার করে তাদের ডাকতে লাগলাম। মশাল দেখে আর হৈ চৈ শুনে বাঘটা লোকটাকে পথের ওপর ফেলে রেখে সরে গেল।

ওরা এসে লোকটাকে ঘিরে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে। আমি গাছের থেকে নেমে এলাম। পথের ওপর থেকে কুড়িয়ে নিলাম আমার ওষুধের ব্যাগটা। লোকটির কাছে গিয়ে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে আমার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে আসতে বললাম। লোকটির তখনও জ্ঞান ফেরেনি। ওরা ওকে আমার হাসপাতালে বয়ে

দিয়ে গেল আজ ক'দিন ধরে সমানে লোকটার চিকিৎসা চলেছে। সম্পূর্ণ আরোগ্য হতে পারেনি এখনও।

রাতে বসে বসে রহস্যময় প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, এত সুন্দর তুমি, অথচ কি ভীষণ।

১৫ই মার্চ : ১৮৯৯

হাডসনের লোক এসে জরুরী খবর দিয়ে গেল, যেন একটুও দেরী না করে আমি কুমডির বাংলোতে যাই।

তাড়াতাড়ি হাসপাতালের কাজ গুছিয়ে আমি বাংলোতে গিয়ে পৌঁছলাম। গেটের সামনেই পায়চারী করছিলেন হাডসন। আমাকে দেখেই বেরিয়ে এলেন। বাংলোতে না গিয়ে হাডসনকে অনুসরণ করে আমরা এসে বসলাম কারো নদীর ধারে নতুন তৈরী সাঁকোটার ওপর। হাডসন আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

ব্যাপার কি বলুন তো, কোন অঘটন কি ঘটেছে?

আমার হাত তেমনি হাডসনের হাতের ভেতর ধরা রইল।

কিছুক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে বললেন, রেবেকা পাগল হয়ে গেছে।

রেবেকা হাডসনের স্ত্রী। আমি গত সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে কথা বলে গেছি। পাগলামোর কোন লক্ষণই তাঁর ভেতর প্রকাশ পায়নি।

বললাম, আনুপূর্বিক ঘটনাগুলো বলে যান।

হাডসন বললেন, ইদানিং প্রায়ই উনি সাসাংদার গীর্জায় যেতেন। তুমি জান, নানা কাজে আমাকে বাইরে বাইরে যেতে হয়। আমি ওঁর সঙ্গে যেতে পারতাম না। ডরোথিকে নিয়েই উনি ওখানে যেতেন। সঙ্গে থাকত আমার আরদালী।

প্রথম দিকে গীর্জা থেকে ধর্মবিষয়ক অনেকগুলি করে বই আনতেন। রাত জেগে তাই পড়তেন।

তুমি জান জনসন, কারু স্বাধীন ইচ্ছায় আমি কখনো বাধা দিতে চাই না।

উনি একঘরে পড়তেন, আমি অন্য ঘরে ঘুমোতাম।

এক রাতে ডরোথির সঙ্গে কি নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি হল। কিছুই বুঝলাম না। তারপর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছেন গীর্জায় যান না, একা একাই ঘরের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান। কি যেন হারিয়ে ফেলেছেন, তাকেই পাতি পাতি করে খোঁজেন। প্রথমদিকে ডরোথিকে দেখলে কথা বলতেন না। এখন ওকে একেবারেই দেখতে পারেন না। কারণে অকারণে তেড়ে যান।

বললাম, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আমি দু'একটি কথা আপনার কাছে জানতে চাই।

স্বচ্ছন্দে, হাডসন বললেন। ডরোথির কি আপনার ওপর কোন দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন?

হাডসন যেন আকাশ থেকে পড়লেন, আমার ওপর! ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব নিকট হলেও বয়সের পার্থক্যটা নিশ্চয়ই তুমি লক্ষ্য করেছ।

আপনি আপনার দিকের কথাই বলছেন, ওঁর মনের দিকটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখেননি।

চিন্তিত হলেন হাডসন। বললেন, আমি কিন্তু কোনদিন তার কোন আভাস পাইনি।

আচ্ছা এটা কি লক্ষ্য করেছেন, আপনার কাছে ডরোথি কোন কারণে এলে আপনার স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

হাডসন কিছুক্ষণ পেছনের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এক সময় বললেন, তোমার অনুমান সত্য বলেই মনে হচ্ছে ডাক্তার।

ডরোথিকে কোন সময়ে আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকতে দেখলেই উনিও সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হন। ডরোথি চলে গেলে উনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর এদিক ওদিক কি যেন খুঁজতে শুরু করেন।

হাডসনের শেষের কথাটার ব্যাখ্যা ঠিক মত করে উঠতে পারলাম না। হাডসনের ওপর ডরোথির অনুরাগকে সন্দেহের চোখে দেখলে রেবেকা ডরোথিকে চোখে চোখে রাখতে পারেন, কিন্তু এর ভেতর খোঁজাখুঁজির প্রশ্নটা আসে কোথা থেকে

ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিকমত পরিষ্কার হল না।

বললাম, আপনি বুঝতেই পারছেন, এ রোগটা সম্পূর্ণ মানসিক সুতরাং মনের চিকিৎসা ছাড়া এর নিরাময় সম্ভব নয়। তবে সাময়িক উত্তেজনা যাতে খানিকটা দূর করা যায় সেজন্যে ওষুধ একটা দিয়ে দিচ্ছি।

আমি আর বাংলোর ভেতর গেলাম না। হাডসন আমার সঙ্গে এলেন হাসপাতালে। ওষুধ তৈরী করে দিয়ে বললাম, কয়েকদিন গেলে তারপর নতুন চিকিৎসার কথা ভাবা যাবে, কি বলেন?

কথা বলতে গিয়ে হাডসনের দিকে তাকিয়ে দেখি ওঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেখানে যেন উদ্বেগের কোন ছায়া নেই।

ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে হাডসন হেসে বললেন, নিশ্চিন্ত হলাম ডাক্তার। পিটারকে নিয়ে রেবেকা সম্বন্ধে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা আর রইল না। ডরোথির ওপর রেবেকার ঈর্ষাই আমাকে এতদিনের দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

হাডসন চলে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম। রেবেকার খোঁজাখুঁজির অর্থটা কিছুতেই আমার কাছে পরিষ্কার হল না।

২০শে এপ্রিল :

মার্চে সারান্দা বনভূমিতে যেন উৎসব লেগে গেল। শীতে শালের পাতা ঝরে গিয়েছিল, বসন্তের বাতাসে নতুন প্রাণের জোয়ার এল। কোথা থেকে শূন্য ডালে জ্বলে উঠল নতুন পাতার আগুন! দেখতে দেখতে ঘন পাতায় গাছ ছেয়ে গেল। গাছে গাছে ফুল এল এক সময়। থোকা থোকা মাখন-রঙের ফুল।

মিষ্টি একরকম গন্ধে সারা বন মেতে উঠল। মৌমাছি পাড়ায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মধু লুটবার। পাহাড়ী ঝোরার ধারে সাংকারলা লতা ভরে সাদা সাদা ফুল এল। হলুদ রঙের কেশর দুলতে লাগল।

শালের গাছে এসে বসল হাজার হাজার টিয়া। আর রাতদিন গাছে গাছে চলল তাদের জলসা। পাতায় পাতায় মিশে রইল তারা।

এদিকে 'বাহা' পরব শুরু হয়ে গেল আদিবাসীদের। শালের ফুল ফুটল আর ওদের মনে লাগল উৎসবের রঙ। নাচ গান চলল ওদের গাঁয়ে গাঁয়ে। আসর বসল শালের ছায়ায় মহুয়ার ফুল কুড়োবার ধুম পড়ে গেল। হাড়িয়া তৈরী হল সেই ফুলে। তারপর হাড়িয়ার মদে মাতামাতি।

'হো' সম্প্রদায়ই এ অঞ্চলে বেশী। সাঁওতাল আর লোহার আছে অল্প সল্প।

পরবে মেয়েদের সাজের বাহার দেখবার মত। বনদেবতা 'জায়েরা'র আস্তানায় পুজো দিতে গেল আমার হাসপাতালের সামনের পথ দিয়ে। খোঁপায় গুঁজেছে লাল, সাদা ফুল আর হরেক রকম পাতা। গান গাইছে। বিচিত্র সুর আর ভাষা। তবে এই আদিম অরণ্য পরিবেশের সঙ্গে ওদের এই গানের সুরের কোথায় যেন একটা গভীর যোগ আছে। বহু রাত অবধি শোনা যায় মাদল, নাগরা আর বাঁশির আওয়াজ।

হাসপাতালে বসে বসে শুনতে পাই ওদের গানের সুর! সেই সঙ্গে দু'এক টুকরো কথাও ভেসে আসে।

'হেসামাতা মাতালেনা, বাড়ীমাতা মাতালেনা,
হেসামাতা চবজনা, বাড়ীমাতা চবজনা,
সমাগেজা তুইম বন্দলেকেনা।'

আমি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ি। উৎসবের দিনগুলোতে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। ওদের গাঁয়ে আমি যেতে আরম্ভ করেছি। কেউবা সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারু চোখে বা কৌতূহল।

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটল।

একটা লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল। অমনি গাঁ উজাড়। এ রোগ ধরলে কাছে পিঠে যে থাকবে তার নাকি নিস্তার নেই! কথাটা শুনেই আমি গাঁয়ে গেলাম। লোকটার ঘরে গিয়ে দেখি সে কাতরাচ্ছে। ওষুধপত্র সঙ্গেই ছিল। চিকিৎসা শুরু করলাম। কয়েক দিনের ভেতর লোকটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

একদিন বসে আছি হাসপাতালের বারান্দায়। দেখি দল বেঁধে আদিবাসী মেয়ে পুরুষ হাজির। কারু হাতে

মুরগী, কারুবা পায়রা, আবার কেউ এনেছে মাটির ভাঁড়ে হাড়িয়া। মেয়েরা ফুল এনেছে। কি ব্যাপার! ওদের ভেতর দেখি সেই লোকটি, যার চিকিৎসা আমি করে-ছিলাম! লোকটি ছিল গাঁয়ের মাতব্বর। সে সেরে উঠেই দলবলকে খবর দিয়েছে। তারা তো তাজ্জব। যে লোকটা নির্ঘাত মরবে সে কিনা এমনি বেঁচে গেল। তারপর সব শুনে ভেট নিয়ে এসেছে আমার কাছে।

মেয়েরা এসে বলল, ফুল নে, তোর বউএর লেগে আনলাম।

আর একটি মেয়ে বলল, কই বউ দেখাবিনা ?

বললাম, আমার বউ নেই।

ওরা সব হেসে লুটিয়ে পড়ল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে আজও আমি বিয়ে করিনি।

তারপর আমার হাসপাতাল ঘুরে উঁকি দিয়ে আমার বউএর খোঁজ করতে লাগল। শেষে কোন মহিলাকে না দেখতে পেয়ে ওরা আবার ফিরে এল। তারপর যে যার নিজেদের খোঁপায় ফুল গুঁজতে লাগল! আমি ওদের কাছ থেকে কিছু ফুল চেয়ে নিয়ে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলাম। ওরা আমার কাণ্ড দেখে হাসতে লাগল। ফুলদানিতে যে কেউ কখনো ফুল রাখতে পারে তা ওরা ধারণাই করতে পারে না।

একজন ফুলদানির দিকে তাকিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটা তোর বউ।

অমনি হাসির ঢেউ উঠল। এই জঙ্গলের মেয়েগুলির ভেতর এত হাসি, এত প্রাণ আছে। দেখলে অবাক হতে হয়।

ওরা মুরগী আর পায়রা আমাকে খেতে দিয়ে গেল। হাসপাতালে বসেই ওরা হাড়িয়া খেল। তারপর আমার উদ্দেশ্যে যে সব প্রশংসা বর্ষণ করতে লাগল তাতে মনে হল, আমি একজন ছদ্মবেশী দেবতা।

ওরা চলে গেল, আর আমি সারাদিন বসে বসে ওদের দারিদ্র্যের কথা ভাবতে লাগলাম।

এই যে :

হাডসনের বাংলোতে গিয়ে দেখলাম, কারো নদীর তীর ঘেঁষে যে খালি জায়গাটা পড়েছিল তাতে সারি সারি ক্যাম্প পড়েছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন হাডসন।

সরকার সারান্দা বনে আদিবাসীদের গাছ কাটা নিষেধ করে নাগরা দিয়েছিল। তাতে আদিবাসীরা ভয়ানক ক্ষেপে গেছে।

বললাম, ওদের আস্তানার গাছ ওরা কাটবে, তাতে বাধা দিতে গেলেই বিপত্তি আসবে, এতো স্বাভাবিক।

কথাটা তা নয় জনসন। প্রথমে ওদের কাছে নামমাত্র খাজনা চাওয়া হয়েছিল। কথাটা ওরা আমলই দেয়নি। তখন বনের কাঠ কাটা নিষেধ করে নাগরা দেওয়া হয়েছে।

বললাম, আর্মড পুলিস ফোর্স এলো কোত্থেকে ? হাডসন বললেন, আমাদের অনুগত যে কয়টি আদিবাসী নাগরা দেবার কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের একটি ছাড়া আর কেউ ফেরেনি।

খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, একটা নাগরাওয়ালাকে অগুণতি তীরে গেঁথে গাছের সঙ্গে প্রায় ক্রুশ বিদ্ধ করে রেখে গেছে। পরিস্থিতি বিশেষ খারাপ হবার আগেই হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠিয়ে ফোর্স আনা হয়েছে।

বললাম, ব্যাপারটা ঘোরাল না করে সহজ সমাধানের একটা পথ বের করলে হত না ?

হাডসন মনে হল উত্তেজিত হয়েছেন। বললেন, রাস্তাঘাট বানাতে সরকারের কি পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে তা তুমি জান, জনসন। যদি তার থেকে ঠিকমত রিটার্ণ না পাওয়া যায় তাহলে সরকার সে লোকসান কতদিন বইতে পারবে। বৃটিশ সরকারের অনুগত কর্মচারী হিসেবে আমাদের এ কথাগুলো ভেবে দেখা দরকার নয় কি ?

হাডসনের কথার কোন জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে রইলাম। ওঁর মুখ থেকেই শুনতে পেলাম, বরাইবুরুতেও এমনি ক্যাম্প পড়েছে। বললাম, ওরা আমাদের এ

ধরণের প্রস্তুতিকে কি চোখে দেখেছে, তার খবর কিছু পেয়েছেন ?

হাডসন বললেন, টাকা পয়সা আর হাড়িয়া খ ইয়ে কতকগুলো ইনফরমার জোগাড় করেছি। তাদের কাছ থেকে যে খবর পেলাম তাতে ও পক্ষের প্রস্তুতি বেশ জোরালই চলেছে বলে মনে হল।

একটু থেমে হাডসন বললেন, ওদিকে ছাতমবুরুর পাহাড়ে লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে। সরকার খুব শীঘ্র পাহাড় ভেঙে লোহা তোলার ব্যবস্থা করবে। সেজন্যে গুয়াভে একটা কলোনী গড়ে তোলারও পরিকল্পনা হয়েছে। তখন এ অঞ্চলটা অনেক বেশী সুরক্ষিত হয়ে যাবে।

বললাম, এই আদিবাসী হো সম্প্রদায় বনের এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে, এদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।

হাডসন বললেন, যতটা ভাবছ, পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের পক্ষে সে পরিমাণে অনুকূল নয়।

একটু থেমে বললেন, ইনফরমারের কথা যদি মিথ্যে না হয় তাহলে শুনছি আদিবাসী এক রাজ পরিবারের মেয়ে নাকি সমস্ত হোদের সঙ্ঘবদ্ধ করছে।

কথাটা শুনে কেমন যেন চমক লাগল। এদের ভেতর কোন প্রতাপশালী রাজার অস্তিত্ব থাকতে পারে এ আমার কল্পনার একেবার বাইরে। তার ওপর আদিবাসী রাজ পরিবারের মেয়ে হোদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর আমি বিরাট এক রহস্যের গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

ফেরার সময় হাডসনকে তাঁর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, নতুন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

কি রকম ?

হাডসন বললেন, আগে আমার কাছে ডরোথিকে দেখলে দু'জনের দিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করতেন; আজকাল ডরোথিকে আমার কাছে আসতে দেখলেই দৌড়ে ঘরে ঢুকে কপাট দিয়ে দেন। অনেক সাধ্যসাধনায় তবে খোলেন। খুলেই কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। চোখেমুখে তখন তাঁর কেমন যেন ভয়ের ছায়া এসে পড়ে।

বললাম, পিটার আসেননি ইতিমধ্যে ?

এসেছিলেন, কিন্তু রেবেকা তাঁর সঙ্গে দেখাই করলেন না। ডরোথি যেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেল অমনি ওঘর থেকে চেঁচাতে লাগলেন রেবেকা

হাসপাতালে ফিরতে গিয়ে সারাপথ নানা চিন্তায় ডুবে রইলাম। এই শান্ত নিরুপদ্রব 'হো'রা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল কেন ? কেনই বা একজনের জন্মগত অধিকার থেকে অন্যজন তাকে বঞ্চিত করতে চায়। কি লাভ এই বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে।

মনে এল সেই 'হো' রাজকুমারীর কথা। এই অরণ্যের ভেতর এমন আগুনই বা ছিল কোথায়! তার শিখায় একদিন হয়ত সমস্ত বনভূমি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

১৩ই মে :

দূর পাহাড়ে আগুন লেগেছে। হাসপাতালের সামনের দাওয়ায় বসে দেখছি। মনে হল আগুনের ফুল দিয়ে একটি মালা গাঁথা হচ্ছে। ক্রমে মালাটি বেড়ে চলল। তারপর এক সময় মনে হল পাহাড়ের গলায় সে মালা সম্পূর্ণ হয়ে দুলছে।

কি প্রচণ্ড গরম এ দেশে। ঘরের বাইরে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কোন কোন পাহাড়ে লোহার পরিমাণ খুব বেশী, গরমও তাই প্রচণ্ড। পাথরের ওপর পাথর গড়িয়ে পড়ল, অমনি আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুনের ছোঁয়া লাগল গাছের শুকনো পাতার রাশে। দাউ দাউ জ্বলে উঠল আগুন। তারপর সামনে যা কিছু পড়ল, অগ্নিনাগ সব গ্রাস করে চলল।

গরমের দিনে বনে বনে এমনি আগুন লাগে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের কাজ বেড়ে যায় তখন। দামী গাছগুলোকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে। যেদিকে আগুন আসছে সেদিকের শুকনো পাতার রাশ বন বিভাগের লোকজন

লাইন ধরে পরিষ্কার করে ফেলে। সাধারণতঃ নদী বা জলার দিকে ঐসব শুকনো পাতা লাইন করে জড়ো করা হয়। আগুন ঐ লাইন ধরে যেতে যেতে এক সময় নদী বা জলায় এসে নিভে যায়।

এবার যেমন গরম পড়েছে অত্যধিক, তেমনি আগুনও জলছে চারদিকে। রাতে যেদিকে তাকাই সেদিকে আলোর মালা। বন পুড়ছে, আদিবাসীদের ঘর পুড়ছে, পশুপাখি পুড়ে মরছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরুলে বনে বনে বিরাট অংশ জুড়ে কালো চিহ্ন দেখা যায়। আগুনের ধ্বংসলীলা এগুলি।

সেদিন বসে আছি, দশ বারোটি আদিবাসী দোলায় বয়ে নিয়ে এল কয়েকটি ছেলেমেয়ে। আগুনে পুড়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করলাম। সবাইকে বাঁচান গেল না। দুটি মারা গেল। তাদের মুখ চোখ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এমন অবস্থায় বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। কিন্তু ডাক্তারের ভাবনা তা নয়' যেমন করে বাঁচুক, চেষ্টা করতে হবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার।

একটি দল ভাল হয়ে গেল দেখে, দলে দলে আগুনের পোড়া রোগী দূর দূর জঙ্গল থেকে আসতে লাগল। আমার ছোট হাসপাতালে আর জায়গা দিতে পারা গেল না। এখন ঘোড়ায় চড়ে ওষুধের বাক্সপত্র নিয়ে যেতে হচ্ছে বিভিন্ন জঙ্গল এলাকায়। গ্রামের লোকদের সঙ্গে এমনিভাবে সেবার ভেতর দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে আমার পরিচিতি।

পথের দু'পাশে ওদের লম্বা ধরণের ঘর। মাটির বা পাথরের দেয়াল। খাপরার ছাউনি। ঘরের মুখগুলো কিন্তু পথের দিকে নয়।

হামা দিয়ে আমাকে অনেক সময় ঘরের ভেতর ঢুকতে হয়। এদের ঘরের মাঝে এক ধরণের উঁচু বেদী আছে। সেই বেদীকে ওরা বলে আদিং। আদিংকে ওরা বিশেষ পবিত্রভাবে রাখে। 'হো'দের পূর্বপুরুষদের আত্মা নাকি তার ভেতর থাকে।

হাসপাতালে ফিরতে ফিরতে ভাবি, কত বিচিত্র সংস্কার মানুষের।

কয়েকদিন আগে হাসপাতালে ফিরে দেখি হাডসন আমার জন্তে অপেক্ষা করছেন, পাশে ডরোথি।

কি ব্যাপার? হাডসনকে জিজ্ঞেস করলাম।

ডরোথিকে দেখিয়ে হাডসন বললেন, বিভ্রাট বাধিয়েছে।

টন্‌সিলটা এত বড় হয়েছে, অপারেশন না করলেই নয়। বম্বেতে থাকার সময়ে অপারেশনের কথা উঠেছিল কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। এখন তোমার হেফাজতেই অপারেশনের কাজটা হয়ে যাক।

ভর্তি করে নিলাম ডরোথিকে। জরুরী কাজ ছিল হাডসনের, থাকতে পারলেন না।

যাবার সময় বলে গেলেন, কয়েকটা দিন ডরোথি থাকবে তোমার এখানে। আমি সময়মত একদিন এসে ওকে নিয়ে যাব।

বললাম, খুব আনন্দের কথা। পরের দিন ডরোথির অপারেশন। সব প্রস্তুত। এনাস্থেসিয়া দেওয়া হল।

একি শুনতে পাচ্ছি! এনাস্থেসিয়ার প্রভাবে ডরোথির অবচেতন মনের কয়েক টুকরো কথা বেরিয়ে এল। কথাগুলি অসংলগ্ন, তব তার মূল্য কম নয়।

'পিটারকে আমি ভালবাসি। তুমি বিবাহিতা।'... 'কাছে এসোনা আমাদের, এসোনা বলছি'।—'চিঠি পাবেনা, কিছুতেই পাবেনা।'...'সরে যাও রেবেকা, নইলে হাডসনকে তোমার সব চিঠি দেখিয়ে দেব।'

অপারেশন শেষ করলাম। ডরোথি ঝিমিয়ে পড়ে রইল। জ্ঞান আসতে দেরী আছে। হাসপাতালের বারান্দায় বসে চিন্তা করতে লাগলাম।

ডরোথি পিটারকে ভালবাসে। রেবেকাও নিশ্চয়ই হাডসনের বিবাহিতা স্ত্রী। প্রকাশ্যে একজন পাত্রীর ওপর সে ভালবাসা দেখাতে পারছেনা। চিঠি এল কোত্থেকে!

হঠাৎ রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়ে গেল। রেবেকার কোন কিছু খোঁজার অর্থ পরিষ্কার হয়ে এল। নিশ্চয়ই ডরোথি পিটারকে লেখা রেবেকার চিঠিগুলো কোনরকমে সংগ্রহ

করে লুকিয়েছে। এটা রেবেকাকে ডরোথির ভয় দেখানর কৌশল। রেবেকাকে ভয় দেখিয়ে পিটারের কাছ থেকে দূরে রাখাই তার উদ্দেশ্য। 'হাডসনকে তোমার সব দেখিয়ে দেব।' ডরোথি এই এক টুকরো কথায় সবকিছু স্পষ্ট করে ধরে দিয়েছে। রেবেকার উন্মাদনা তাহলে এই কারণে। প্রথম দিকে সে হাডসন আর ডরোথিকে চোখে চোখে রেখেছিল, তার কারণ ডরোথি হাডসনকে তার চিঠির কথা বলে কিনা দেখার জন্যে। পরে তার পাগলামো যখন বাড়ল তখন তার মনে হল, হাডসন নিশ্চয়ই তার গোপন প্রণয়পত্রের কথা জানতে পেরেছে। ইদানিং তাই সে ভয়ে ভয়ে থাকতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু রেবেকার চিঠিগুলো ডরোথি কোথায় লুকিয়েছে। নিশ্চয়ই ডরোথি কাছছাড়া করেনি সেগুলো।

অমনি উঠে গেলাম ভেতরে। ডরোথির হাত ব্যাগ থেকে চাবি বের করে ওর স্যুটকেশটা খুললাম। স্যুটকেশের ভেতরে ওর দৈনন্দিন ব্যবহারের পোষাক রয়েছে। নাড়াচাড়া করতে করতে তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একরাশ চিঠি।

এ চিঠি নিশ্চয়ই রেবেকার। কারণ রেবেকার হাতের লেখা আমার কাছে অপরিচিত নয়। মাঝে মাঝে বাংলো থেকে আমার নিমন্ত্রণ আসত। সেই নিমন্ত্রণের চিঠি রেবেকাই লিখে পাঠাতেন। তাঁর চিঠির ভাষাও ছিল বিশেষ উপভোগ্য।

চিঠিগুলো কাছে রেখে দিলাম। ডরোথি সুস্থ হয়ে উঠলেন একদিনেই।

হাডসনের কাছে চিঠি লিখলাম, তিনি যেন রেবেকাকে অবশ্যই পাঠিয়ে দেন হাসপাতালে। আমি তাঁর চিকিৎসা করব।

হাডসন চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই রেবেকাকে নিয়ে এলেন।

বললাম, দু'বোনকে আমি কয়েকদিন এক সঙ্গেই রাখতে চাই।

হাডসন বললেন, স্বচ্ছন্দে। উনি চলে গেলে রেবেকাকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম শালবনে বেড়াতে। আমার কাছে রেবেকা চুপচাপ থাকেন, এটা লক্ষ্য করেছি। আমি আগে আগে চলেছি, রেবেকা আসছেন পেছনে। এবার একটু পিছিয়ে ওঁর পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

বললাম, আপনার ব্যবহার আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে।

রেবেকা আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, আপনার কোনরকম উপকার করতে পারলে আমি খুব খুশি হই।

রেবেকার মুখে কেমন যেন ভাবান্তর হল।

বললেন, আপনি আমার উপকার করতে পারেন, সত্যি বলুন?

নিশ্চয়ই পারি।

আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে রেবেকা আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন, না, আপনি পারেন না।

সামনের একটা পাথর দেখিয়ে বললাম, আসুন এর ওপর বসা যাক্। রেবেকা আর আমি বসলাম পাথরটার ওপর।

পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে রেবেকার হাতে দিয়ে বললাম, দেখুন তো হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কিনা।

মানুষের মুখের এমন পরিবর্তন আমি আগে কখনো লক্ষ্য করিনি।

মুহূর্তে রেবেকা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, এ চিঠি আমার, এ চিঠি আমার।

পরক্ষণেই আমার দিকে তাকিয়ে কাগজের মত রক্তশূন্য হয়ে গেলেন, এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন জনসন। ডরোথি আমার সব চিঠিই তো চার্চে গিয়ে পিটারের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে।

বললাম, আমি যদি আপনাকে আপনার সবগুলো চিঠিই ফিরিয়ে দিই।

আমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসলেন রেবেকা। চিরদিন কৃতজ্ঞ হয়ে রইব মিঃ জনসন।

বললাম, প্রতিদানে আমি যদি কিছু চাই, দেবেন ?

আমি নিশ্চয়ই দিতে চেষ্টা করব জনসন। বললাম, কথা দিন, হাডসনকে ছেড়ে কোনদিন আর পিটারের কাছে যাবেন না !

কতক্ষণ আপনমনে কি ভাবলেন রেবেকা। দু'চোখ বেয়ে জল নামল। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আমি আর বাধা দিলাম না। কাঁদতে কাঁদতে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেলে, মানসিক যন্ত্রণার গুরুভারটা নেমে যাবে।

এক সময় শান্ত হলেন রেবেকা। বললেন, আমি জানতে চাইনা কি করে ডরোথির কাছ থেকে আপনি আমার চিঠিগুলো উদ্ধার করলেন। তবে আমি আর পিটারের কাছে যাব না কথা দিচ্ছি।

ওঁর হাতে চিঠির গোছা তুলে দিতে যেতেই উনি কি যেন ভাবলেন।

আপনি ওগুলো রেখে দিন মিঃ জনসন। মানুষের মন, কখন কি হয় বলা যায় না। চিঠিগুলো আপনার কাছে থাকলে তবু মনে একটা ভয় থাকবে।

বললাম, আপনার ভয় থাকবে কিনা জানিনা, তবে নির্ভয় হয়েছি, এ কথা বলতে পারি।

চিঠিগুলো পাথরের ওপর জড়ো করলাম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

দাউ দাউ করে রেবেকার জীবনের অনেকগুলো স্মৃতি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল।

২রা অক্টোবর :

কয়েক মাস বর্ষার ভেতর কাটল। এবার পথের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। সরকারী বনবিভাগের পুলিশের যাতায়াতের জন্যে হাডসন বিশেষ পরিশ্রম করে পথঘাট ভালভাবে মেরামত করে রেখেছিলেন। বর্ষায় কর আদায় কিংবা জঙ্গলের বাসিন্দাদের ওপর জোর জুলুমের কোন চেষ্টাই করা হল না।

এই বর্ষায় আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। কাজের ভেতরে থেকেও যা আমি একেবারেই ভুলতে পারছি না।

কয়েকদিন একটানা বৃষ্টির ভেতর হাসপাতালে বন্দী থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ সকাল থেকে মেঘ কেটে গেল।

বর্ষাধোয়া আকাশে সোনা রঙের রদ্দুরটুকু বড় উপভোগ্য হয়ে উঠল। আমি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথের ধারে গাছপালার মখমলের মত সবুজ পাতার ওপর রোদের সোনা গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাই দেখতে দেখতে চললাম। পাহাড়ী ঝোরার ধারে ঐ যে বসে আছে ধনেশ পাখি। বড় বড় বাঁকানো শান দেওয়া ঠোঁট। হরিয়াল উড়ে গেল। আকাশের গায়ে যেন মিশে গেল আকাশী রঙ। পথে পথে বন-যুঁই। সবুজ পাতার ওপর একরাশ সাদা তারা-ফুল ফুটিয়ে রেখেছে। কি মিষ্টি গন্ধ।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি আর প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য দেখছি। দেখতে দেখতে কতদূর চলে এসেছি, বুঝতে পারিনি।

সামনে আর এক রূপের জগত আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

একটি শালগাছের তলায়, যেখানে পাথরের গর্তের ভেতর বর্ষার জল জমেছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে শিশুকে নিয়ে মা-হরিণী।

জল খেতে এসেছে বোধহয়। ঘোড়ার পায়ের সাড়া পেয়ে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বর্ষাধোয়া রোদ তাদের সুচিক্কণ দেহের ওপর থেকে যেন পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

ওরা তাকিয়ে আছে, আমিও ওদের থেকে চোখ ফেরাতে পারছিনা। মা-হরিণী বাচ্চাটাকে লেহন করতে লাগল! এত স্নেহ জননীর। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। কত শৈশবে মাকে হারিয়েছি।

বর্ষাধোয়া প্রকৃতির মত মনটা কেমন ভিজে আর নরম হয়ে গেল।

বেলা বাড়ল। আমি এপথে ওপথে চলতে লাগলাম। যখন খেয়াল হল তখন দেখি আমি চেনা পথ হারিয়েছি। একটি পথ ধরে কিছু সময় ঘোড়া ছুটিয়ে যাই, আবার অন্য

পথ ধরি। এমনি ভাবে চলতে চলতে এক সময় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এদিকে আকাশ ঘিরে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

সামনে একটি উঁচু টিলা দেখে ঘোড়া ছেড়ে তার উপরে উঠলাম যদি এর ওপর থেকে কোনরকম চেনা জায়গার সন্ধান পাওয়া যায়। টিলার ওপর উঠে সামনে যতদূর দেখা যায়, অসংখ্য পাহাড়ের রাজ্য।

নীল সবুজে মেশা পর্বততরঙ্গ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কি অপরূপ সৌন্দর্য ঈশ্বর এই দুটি চোখের জন্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

বামে চোখ পড়তেই দেখলাম, খুব কাছেই একটি উপত্যকা। সহসা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। গাছপালার ফাঁকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা ভাঙা দুর্গের মত কি যেন আমার চোখে পড়ল।

এখানে আদিবাসী এলাকায় দুর্গ এল কোত্থেকে। ভাল করে দেখলাম, মন্দির রয়েছে একদিকে। একটি জলধারা বয়ে চলেছে দুর্গ বেষ্টন করে।

কতক্ষণ এমনি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ একটা নাগরার আওয়াজ শুনে টিলার ওপর থেকে নেমে এলাম। কোথা থেকে নাগরার শব্দটা আসছে তা বোঝা গেল না। কারণ মুহূর্তে সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে পাহাড়ে। দূরে কাছে যত পাহাড় আছে, মনে হল তাদের প্রতিটির থেকেই এ শব্দ-তরঙ্গ উঠে আসছে।

টিলার থেকে নেমেই ঘোড়ায় চড়ে যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে ফিরে চললাম। পাহাড়ী বাঁক ঘুরতেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার বিস্ময় চরমে উঠল।

ঘোড়ার ওপর চড়ে একটি মেয়ে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণ 'হো' সম্প্রদায়ের মেয়েদের ভেতর যে রূপ দেখেছি, তার থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। কেবল গায়ের রঙের কিছুটা মিল আছে, তবু আদিবাসী 'হো' দের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল। দেহের গড়ন সুঠাম। মনে হল যেন পাথর কুঁদে দক্ষ কোন শিল্পী এ মূর্তিটি গড়েছেন।

আমি তার উপস্থিতি ভুলে, সেই বিশেষ ধরণের পরিবেশের কথা ভুলে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটি প্রথমে কথা বলল, এ অঞ্চলে আসার কারণটা জানতে পারি কি?

পথ হারিয়ে হঠাৎ এসে পড়েছি। আস্তানা? বরাইবুরু না কুমডির বাংলোতে।

বললাম, এদের ভেতর কোনটাতেই নয়।

তবে? কথার ভেতর সামান্য একটু ঝাঁঝ ছিল।

বললাম, থলকোবাদের হাসপাতালে আপাততঃ আমার ডেরা।

মেয়েটি সহসা ঘোড়ার থেকে নেমে মাথা নীচু করে আমাকে অভিবাদন জানাল।

আপনিই ডাক্তার জনসন! কথা শুনে আমি হতবাক। এতদূরে এই রহস্যময়ী মেয়েটি আমার নাম জানল কি করে।

আমাকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি বলল, এর আগে আপনাকে আমি না দেখলেও, আপনার নাম আমার কাছে অপরিচিত নয়।

আকাশে মেঘের ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি, বর্ষার প্রায় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে।

মেয়েটি কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, অনেক দূরে এসে পড়েছেন জনসন, তাছাড়া এই ছোট নাগরা এলাকাটাও ইংরাজদের পক্ষে খুব সুখকর নয়।

আসুন, আপনার পথে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

মেয়েটি আগে আগে চলল, আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। ভাঙা চোরা, উঁচুনীচু কত অজানা অচেনা পথ ধরে মেয়েটি অবলীলায় এগিয়ে চলল, আর আমি তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করতে লাগলাম।

এক জায়গায় এসে দেখলাম, দুটি পাহাড়ের মাঝে গিরিসঙ্কট। সেই ফাঁকে একটি খরস্রোতা জলধারা বয়ে চলে গেছে উপত্যকার একেবারে ভেতরে। কাছাকাছি এসেই মেয়েটি বলল, সাবধানে আমাকে লক্ষ্য রেখে আসুন।

ওকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সেই

পার হলাম

মনে হল, এই অঞ্চল মেয়েটির একেবারে নখদর্পণে।

এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার পথ প্রদর্শিকা বলল, এখন যতদুর সম্ভব দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে আমাকে অনুসরণ করুন। আকাশের অবস্থা ভাল নয়।

বৃষ্টি হলেই কোয়েল নদীতে বান আসবে। তখন পার হওয়া দুঃসাধ্য হবে। পথ সংক্ষেপ করার জন্তে ওপরের পথ ছেড়ে নিচের পথেই আমাদের চলতে হচ্ছে।

বেশ কিছু সময় চলার পর আমরা কোয়েলের কূলে এসে পৌছলাম। ঘোড়া পার হতে গিয়ে পিঠ অবধি জলে ডুবল! আমরা ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে পার হলাম, তাই পোষাক কোনরকমে রক্ষা পেল।

কোয়েল পেরিয়ে আসতেই চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এল। আরও কিছু পথ একসঙ্গে আসার পর মেয়েটি বলল, আশাকরি এখন আপনি আপনার চেনা পথ পেয়ে গেছেন।

এতক্ষণ ওকেই অনুসরণ করে এসেছি, তাই পথ চেনার দরকার হয়নি, এখন চোখ মেলে ভাল করে চারদিকে তাকালাম।

সামনেই কুমডির পথ চলে গেছে। দু'জনে পথের ওপর উঠে এলাম।

মেয়েটি ঘোড়ার থেকে নেমে দাঁড়াল, আমিও নামলাম।

আপনি আমাদের জঙ্গলের লোকদের ভালবাসেন সেজন্তে আমরা কৃতজ্ঞ।

বললাম, ডাক্তারের কাছে যেমন রোগের বিচার নেই, চিকিৎসাই একমাত্র ধর্ম, ঠিক তেমনি মানুষেরও বিচার নেই! সেবা করার জন্তেই আমাদের জন্ম।

ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। রহস্যময়ী মেয়েটি আমাকে শেষ বারের মত অভিবাদন জানিয়ে বলল, আশা কার আজকের এই সাক্ষাতের কথা লোকের মুখে রটবেনা।

ডাক্তার জনসন অকৃতজ্ঞ নয়।

বৃষ্টি জোরে জোরে পড়তে লাগল। বাতাস বইল। মেয়েটি ঘোড়ায় উঠে বলল, আপনি যান ডাক্তার জনসন। বান আসার আগেই আমাকে অন্ততঃ কোয়েল নদী পার হয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

দ্রুত ঘোড়া ছুটল। চোখের পলকে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ফিরে চললাম কুমডির বাংলো লক্ষ্য করে। কিন্তু অল্প দূর যেতে না যেতেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বাতাসের বেগও দ্রুত হল। একান্ত চেনা পথে আমার কোন অসুবিধে হল না! কুমডির বাংলোতে বেলা শেষের আগেই পৌছে গেলাম। কিন্তু আমার চিন্তায় কেবল একটি কথা আসা যাওয়া করতে লাগল, বান আসার আগেই সেই রহস্যময়ী নদী পার হয়ে যেতে পেরেছে কি।

১৯শে ডিসেম্বর :

প্রথমে সাসাংদা গীর্জা আক্রান্ত হল। আগুন লাগিয়ে কাঠ আর খড়ের তৈরী গীর্জা, সংলগ্ন বাসগৃহগুলি পুড়িয়ে দিল বিদ্রোহীরা।

তার আগে বিবাদের সূত্রপাত হল ছাতমবুরুতে। হো'দের ঈশ্বর সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার আস্তানা ছিল ঐ পাহাড়ে। সেখানে সরকারী কর্ম্মচারীরা পাহাড়ের চারদিকে সুতরাং সরকারী নিয়ন্ত্রণের ভেতর আনা হল ছাতমবুরুকে।

'হো'দের অসন্তোষ আগেই ধূমায়িত হয়েছিল। সরকারকে কর দেবার ব্যাপারে, বনের কাঠ কাটার ওপর নিষেধ জারির ব্যাপারে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল; তার ওপর ধর্মস্থান যখন বন্ধ হল তখন ধূমায়িত আগুন দাউ দাউ করে জলে উঠল।

এর ফলে সাসাংদার গীর্জায় প্রথম শুরু হল বিদ্রোহীদের হানা। পিটার আর তাঁর দলবলের ওপর কোন রকম আক্রমণ করা হয়নি। তাঁরা কুমডির ডাক বাংলোতেই আশ্রয় নিলেন।

সরকারী পুলিশ ফোর্স গেল সাসাংদায়। হার মানলেই বিদ্রোহীরা সুযোগ পাবে বেড়ে ওঠার। তাই নতুন করে গীর্জা তৈরীর কাজ শুরু হল। কয়েকদিনের

ভেতর নতুন ছাউনি উঠল। আবার পিটার চললেন তাঁর দলবল নিয়ে। এবার গীর্জা সংলগ্ন জমিতে পুলিশ ব্যারাকও তৈরী হল। গীর্জা আক্রান্ত হলে সরকারী বাহিনী তা রক্ষা করবে। এদিকে আদিবাসীদের ভেতর যারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা দলে দলে চলে এল সাসাংদার কাছাকাছি। সরকারের আশ্রয়ে না থাকলে তাদের হয়ত নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। সরকারী পুলিশ সাসাংদার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও টহল দিতে শুরু করল।

কয়েকদিন চুপচাপ কেটে গেল। সরকারী বাহিনী পর্যবেক্ষণ করতে লাগল আক্রমণের প্রকৃতি। ওদিক থেকেও কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না।

কেবল ইনফরমারদের মুখে শোনা যেতে লাগল নানান কাহিনী। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত 'হো', 'লোহার', 'মুণ্ডারী', 'সাঁওতাল' সম্প্রদায়কে একত্রিত করা হচ্ছে। ঐ একটি মেয়েই এ কাজে অগ্রণী হয়েছে।

মনে মনে মেয়েটিকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না। আমি নিশ্চয়ই দেখেছি তাকে। আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, ইচ্ছা করলে সেই রহস্যময়ী তরুণীর দ্বারা সব কিছু করাই সম্ভব।

মেয়েটির নাম নাকি শনিচারিয়া। নামটা বার বার উচ্চারণ করলাম। তার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল আমার চোখের ওপর। কিন্তু আমি কারু কাছে তার কথা বলতে পারলাম না।

আবার খবর পেলাম সাসাংদার গীর্জা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সংলগ্ন গ্রামের একটি কুটিরও অক্ষত নেই। মাঝরাতে যখন সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, শুধু দু'একজন পাহারাদার গীর্জা সংলগ্ন ব্যারাকে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তখনি আক্রমণ শুরু হয়।

সকলে জেগে উঠে দেখে গীর্জা জ্বলছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে সমস্ত গ্রামখানা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বিদ্রোহীদের ভেতর একটি মানুষেরও সন্ধান পাওয়া গেল না।

ভোরে উঠে রহস্যের সমাধান হল। তীরের মুখে আগুন জ্বেলে বহু দূর থেকে বিদ্রোহীরা গীর্জা আর গ্রাম লক্ষ্য করে ছুঁড়েছে। তার ফলে এই অগ্নিকাণ্ড।

সরকার এবার এক একটি গ্রাম লক্ষ্য করে ঘেরাও করল। কর আদায়ের জন্যে মারধোর শুরু হল। কিন্তু খবর পেলাম, একটিও মানুষের কাছ থেকে নাকি কর আদায় করা সম্ভব হয়নি। গ্রামের মাতব্বরদের ধরে নিয়ে আসা হল বরাইবুরুর ক্যাম্পে। সেখানে তাদের ওপর চলল অত্যাচার। কিন্তু কারু মুখ থেকে তাদের প্রধান ঘাঁটির খবর বের করা গেল না।

বরাইবুরুতে গড়ে উঠেছিল সাময়িক কয়েদখানা। দলে দলে আদিবাসীদের ধরে নিয়ে এসে সেখানে কয়েদ করে রাখা হত। কথা আদায়ের জন্যে চলত নানা রকমের অত্যাচার।

একদিন বরাইবুরুর কোয়ার্টার থেকে আমার ডাক এল। গিয়ে দেখি, কয়েকটি আদিবাসী কয়েদখানার মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাদের নাকে মুখে রক্ত চাপ বেঁধে জমে আছে।

কথা বলে জাননাম, তাদের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে অতিরিক্ত প্রহারের ফল।

এদের সুস্থ করে তোলার ভার পড়ল আমার ওপর। কারণ এরা নাকি অনেক কিছুই জানে। বিদ্রোহী আদিবাসী দলের অন্যতম তিনজন প্রধান এরা।

সাধ্যমত চিকিৎসা করলাম। আর্তের চিকিৎসা করা আমার কর্তব্য বলে আমি করলাম। কিন্তু যে অবস্থার ভেতর ওরা পড়েছে তাতে মৃত্যুর আগে নিষ্কৃতি পাবে বলে মনে হল না।

শুনলাম, এরা একটু সুস্থ হলেই আবার শুরু হবে জেরা। দিনরাত্রি পুলিশের লোকে এদের সঙ্গে কথা কইবে। বিশ্রামের কোন সুযোগই দেওয়া হবে না এদের। তারপর নখের ভেতর স্ঁচ ঢুকিয়ে কথা আদায়ের চেষ্টা চলবে।

ফিরে এলাম হাসপাতালে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মানুষের ওপর এ ধরণের নির্দয় অত্যাচারের ভেতর যে পশু মনোবৃত্তি আছে, আমার আত্মাকে বার বার তা পীড়া

দিতে লাগল। একবার ভাবলাম, চাকরী ছেড়ে চলে যাব এখান থেকে। আবার মনে হল, এখানে থাকলে তবু আহতের সেবার সুযোগ পাওয়া যাবে। সাধ্যমত তাদের সারিয়ে তোলার চেষ্টা করব। আমার জাতি, আমার দেশ আজ ভিন্ন দেশের মানুষের ওপর যে অন্যায় আচরণ করছে, তার সামান্য কিছু যদি আমার সেবার ভেতর দিয়ে লাঘব করতে পারি। সেদিন আর একটি অমানুষিক ঘটনা ঘটতে দেখলাম।

বরাইবুরু থেকে ডাক আসতে গিয়ে দেখি একটি মেয়ে কয়েদখানায় পড়ে আছে। দেহ তার ক্ষত-বিক্ষত। পরীক্ষা করে দেখলাম, অত্যাচারের শেষ সীমায় সে এসে পৌচেছে। মানুষের পশুবৃত্তি কতদূর পর্যন্ত পৌছতে পারে তার পরিচয় পেলাম সেদিন।

চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাঁচান গেল না।

মেয়েটি নাকি কয়েকদিন আগে উপযাচক হয়ে এসেছিল ইনফরমারের কাজ করবে বলে। তারই নির্দেশ-মত এখানকার পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের একটা গুপ্ত ঘাটির সন্ধানে যায়। মেয়েটিকে কিন্তু আটকে রাখা হয় বরাইবুরুর ব্যারাকে।

পুলিশ বাহিনী মেয়েটির নির্দেশিত পথে এসে পৌছল একটি পাহাড়ী নদীর কাছে। নদীতে জল ছিল হাঁটু পরিমাণ। সেখান থেকে গুপ্ত ঘাটির দুরত্বও ছিল অনেকখানি। তারা যখন সবাই মিলে নদী পার হচ্ছিল, তখন হঠাৎ পাশের জঙ্গল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়তে লাগল তাদের ওপর। দু'চারটি ছাড়া বিরাট পুলিশ বাহিনীর প্রায় সবকটিই নিঃশেষ হয়ে গেল।

এরপর মেয়েটির ওপর শুরু হল অত্যাচার। প্রতি পক্ষের গুপ্তচরের ওপর যে ধরণের আচরণ এদের বিধানে আছে, তাই করতে লাগল এরা।

শুনলাম, পুলিশ বাহিনীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার খবর শুনে মেয়েটি সেই যে হাসি শুরু করেছিল, অজ্ঞান হয়ে যাবার আগের মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সে হাসি আর থামেনি।

সে নাকি অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে বলেছিল, তাঁর স্বামীকে মেরে ফেলার প্রতিশোধ সে নিয়েছে।

মৃতের কাছ থেকে চলে আসার সময় টুপি খুলে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে মনে মনে বললাম, এ দেশের মানুষের ওপর আমার শ্রদ্ধা তুমি বাড়িয়ে দিলে।

আমার অন্তরের অভিনন্দন রইল তোমার উদ্দেশ্যে। সর্বময় প্রভু তোমার মঙ্গল করুন।

শুনলাম, উড়িষ্যা থেকে আদিবাসীরা দলে দলে আসছে সারান্দায়। হাতে তাদের তীরধনু আর টাঙি। তাদের গতি রোধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল সরকার থেকে, কিন্তু সম্ভব হয়নি। গভীর পাহাড়ী জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা দলে দলে পথ করে চলেছে। সে দুর্গম পথের সন্ধান রাখা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই দলটিকে গভীর অরণ্যের ভেতর দিয়ে যিনি পরিচালনা করে আনছেন, তিনি নাকি অশ্বারোহিণী। এক আদিবাসী কন্যা।

সেই মেয়েটিকে ধরার জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হয়ে গেছে।

দিনের আলোয় পাহাড়ের গুপ্তস্থানে আত্মগোপন করে রাতের অন্ধকারে তারা পথ চলে এসে পৌচেছে সারান্দায়।

৭ই এপ্রিল : ১৯০০

এবার হাডসন বরাইবুরুর হেড কোয়ার্টারে একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাটি ছিল এইরূপ গ্রীষ্মকালে বনে বনে যখন আগুন লাগবে, আর সে আগুন ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে, তখন তাকে নেভাবার কোন চেষ্টাই করা হবে না। বরং নদীর বিপরীত মুখে দুর্গম আদিবাসী এলাকায় যাতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

হেড কোয়ার্টার মেনে নিল হাডসনের এই পরিকল্পনা। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরের মত এ বছরও আগুনের ভয়াবহ খেলা শুরু হয়ে গেল।

সরকারী চেষ্টায় যে আগুনের গতি নদীর পথে চালনা করা হত, তা আর হতে পারলনা। ফলে, আগুনের তাণ্ডব চলল সারা গ্রীষ্মকাল ধরে।

আমার হাসপাতালে কিছু কিছু আগুনে পোড়া রোগী আসতে লাগল। আমি তাদের সেবায় রাতদিন নিযুক্ত রইলাম। কিন্তু বেশীদিন তা করা চলল না। সরকার থেকে আমার কাছে কড়া নির্দেশ এল, আমি যেন আদিবাসী রোগীদের সরকারী হাসপাতালে ভর্তি না করি।

এর উত্তরে আমি জানালাম, আমি ডাক্তার; রোগী এলে তাদের ফেরান আমার সাধারণ সেবাধর্মের নীতির বাইরে। সুতরাং আমাকে এই হাসপাতালের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

আমার সাফ জবাবে কর্তৃপক্ষ কিছুটা নরম হলেন। তাঁরা আর আমাকে বরখাস্ত বা বদলী করতে চাইলেন না।

কিন্তু আর একটি উপায় তাঁরা অবলম্বন করলেন।

বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে নাগরা পিটিয়ে তাঁরা ঘোষণা করতে লাগলেন যে, এরপর যদি কোন আগুনে পোড়া রোগীকে হাসপাতালের পথে বয়ে আনতে দেখা যায় তাহলে তাদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

এই ঘোষণায় আমি খুব আহত হলাম। কিন্তু আমার দিক থেকে এর প্রতিবাদে কোন কিছু করার রইল না।

হাসপাতালে রোগীর আসা বন্ধ হয়ে গেল। সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম।

শেষে স্থির করলাল, রাতের বেলাতেই গোপনে আমি পাহাড়ী গ্রামে গ্রামে যাবার চেষ্টা করব।

শেষ পর্যন্ত তাই শুরু করলাম। রাতে ঘোড়ায় চড়ে পথে যেতে খুব অসুবিধে হত। অন্ধকার রাতে পথ চিনে যেতে পারতাম না। চাঁদের আলোয় বের হতাম। এ অঞ্চল গুলো আমার চেনা জানা হয়ে গিয়েছিল, তাই বিশেষ কষ্ট হত না।

রোগীর সেবা করে যখন হাসপাতালে ফিরতাম, তখন মনটা তৃপ্তিতে ভরা থাকত! পথের হিংস্র পশুর ভয় আমার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারত না

এবার বিপদ এল অন্যদিক থেকে। ওষুধ ফুরিয়ে এল। কর্তৃপক্ষের কাছে ওষুধ পাঠাবার জন্যে লিখতেই উত্তর এল, সরকারী আগুনে পোড়া কর্মচারীর সংখ্যা নিশ্চয়ই এমন অধিক নয় যে প্রভূত পরিমাণ ওষুধ ডাক্তার জনসনের দরকার হতে পারে।

আমি প্রায় নিরুপায় হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে শুধু হাতে গিয়ে ওদের সমবেদনা জানিয়ে আসি। ওষুধ নেই, তাই আজকাল সবদিন আমার আর গ্রামে যাওয়া হয় না।

এক সন্ধ্যায় হাসপাতালে বসে বসে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। আগুন জ্বলছিল সে পাহাড়ে। আমার মনে এসেও লাগছিল সে আগুনের আঁচ। এমন সময় একটি বলিষ্ঠ মানুষ আমার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। দেখলাম, লোকটি আদিবাসী।

আমাকে অভিবাদন করে সে বলল, ডাক্তার জনসন, যদি অনুগ্রহ করে আগুনে পোড়া রোগীর ওষুধগুলো লিখে দেন তাহলে আমি আপনাকে তা আনিয়ে দিতে পারি।

বিস্মিত হলাম। এখানে কাছেপিঠে এমন কোন মেডিক্যাল স্টোর নেই যেখান থেকে ওষুধ নিয়ে আসা যায়।

বললাম, আমি লিখে দিচ্ছি, কিন্তু ওষুধ এ অঞ্চলে পাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া আমার হাতের লেখা প্রেসক্রিপসন যেন কর্তৃপক্ষের হাতে কোনরকমে না পড়ে।

লোকটা আমার প্রেসক্রিপসন নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

কয়েকদিন পরেই দেখি সেই লোকটি আবার ফিরে এসেছে। বিরাট একটি ওষুধের প্যাকেট আমার হাসপাতালের বারান্দায় নামিয়ে রেখে সে বলল, ডাক্তার জনসন, আশাকরি এর পর আপনার চিকিৎসার কোন অসুবিধে হবেনা।

লোকটি আর অপেক্ষা না করে ঘোড়ার পিঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি একটু অবাক হলাম। প্রথম যেদিন লোকটি আসে সেদিন ভেবেছিলাম দরকারটা ওরই বাড়ীর। হয়ত কোন সম্পন্ন আদিবাসী ও। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। আমি নিজের সম্প্রদায়ের ওপর দয়ালু এই লোকটিকে মনে মনে অশেষ সাধুবাদ দিলাম।

এরপর আদিবাসীদের সেবা করতে আমার আর কোন অসুবিধেই হল না।

১৭ই ডিসেম্বর :

এবার বর্ষায় লড়াই চরমে পৌছল। হাডসন এ বছর আরও উৎকৃষ্টভাবে পথঘাট তৈরী করে রেখেছিলেন।

নতুন কয়েকটা পথও শুকনোর দিনে তৈরী করা হয়েছিল। তবে সে সব পথে আশানুরূপ কাজ এগোয়নি। কারণ আদিবাসীরা লড়াইএর জন্যে সরকারী কাজ করতে নারাজ।

এবারও কর্তৃপক্ষ বর্ষাতে চুপচাপ থাকতে মনস্থ করেলেন। কিন্তু তার সুযোগ পাওয়া গেলনা।

বর্ষা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে আদিবাসী তীর ধনু, টাঙি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন পুলিশ ঘাঁটি লক্ষ্য করে। সমানে লড়াই চলল। বাঁধান সরকারী পথ বিদ্রোহীরা জায়গায় জায়গায় কেটে দিলে। বর্ষার জল সেই পথে গড়িয়ে গিয়ে ভয়াবহ খাদের সৃষ্টি করল।

যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

শুনলাম, হাজার হাজার আদিবাসী যোদ্ধা নিয়ে সেই বীরাঙ্গনা ছাতমবুরুর পাহাড় অধিকার করে নিয়েছে।

মনে মনে তাকে অজস্র সাধুবাদ জানালাম। এদিকে ভয় পেয়ে গেলেন হাডসন। রেবেকা আর ডরোথিকে পাঠিয়ে দিলেন আমার হাসপাতালে। বরাইবুরুতে যে লড়াই হল, তাতে উভয় পক্ষেই হতাহত হল অগণিত। আদিবাসীরা তাঁদের বেশীর ভাগ শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিল ছাতমবুরু উদ্ধারের জন্যে। কারণ সেইটাই ছিল তাদের দেবস্থান।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। যে ভাবে বর্ষার সূচনা হয়েছিল তা একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। বর্ষার দিনে আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র রইল না। হাডসন ভাঙা পথ আবার গড়ে তুললেন। সংবাদ পাঠিয়ে বহু সংখ্যায় সশস্ত্র পুলিশ আনা হল এবার প্রবলভাবে সরকার পক্ষের আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। পক্ষকাল যুদ্ধ চলল সমানে। শেষে হটতে লাগল আদিবাসীর দল। ছাতমবুরুর পাহাড় ছেড়ে দিতে হল তাদের। এবার গভীর জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল তারা।

একটি বিষয় বরাবর আমি লক্ষ্য করছিলাম। লড়াইএ যাতে কম লোকক্ষয় হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল নেত্রীর। ছাতমবুরু রক্ষার জন্য আরও বহুদিন যুদ্ধ চালাতে পারত আদিবাসীরা, কিন্তু তা তারা করল না, লড়াইতে এই সূক্ষ্ম বিবেচনা বোধ যাঁর, তাঁর ওপর গভীর শ্রদ্ধা না জেগে পারে না।

বিধাতা সত্যই এবার জঙ্গলের মানুষগুলির বিপক্ষে দাঁড়ালেন। বর্ষাকালে নামমাত্র বৃষ্টি দিয়েই আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেল। চারদিকে অনাবৃষ্টি। ফসল ফলল না এককণা। এদিকে দীর্ঘকাল যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আদিবাসীরা। কয়েক মাস পরে তাদের মাঝে নেমে এল ভয়াবহ অনাহার আর মৃত্যুর আতঙ্ক। সারান্দা বন জুড়ে শুরু হয়ে গেল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর ধ্বংসলীলা।

সরকার এবার এক কৌশল অবলম্বন করল। ঘোষণা করা হল, ছাতমবুরুতে সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার মন্দির আদিবাসীদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হবে! তাছাড়া যে সকল আদিবাসী সরকারের কাছে নতি স্বীকার করবে, দুর্ভিক্ষের দিনে তাদের ভরণ পোষণের ভার সরকার গ্রহণ করবে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘোষণাও করা হল, যে রাজকুমারী শনিচারিয়ার সন্ধান সরকারকে দিতে পারবে তাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঘোষণার পর কিছুকাল পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর একে একে সরকারী ক্যাম্পে আদিবাসীরা আসতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সারান্দা বনভূমির ক্ষুধার্ত মানুষগুলো জলস্রোতের মত বরাইবুরুর ক্যাম্পে সাহায্যের জন্য ভেঙে পড়ল।

কর্তৃপক্ষ ক্ষুধার্ত লোকগুলোকে নিয়ে শুরু করল জিজ্ঞাসাবাদ। রোজ নানা ধরণের লোক সাহায্যের আশায় আসা যাওয়া করত। কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে প্রধান ঘাঁটির খবরটা সংগ্রহ করল।

ছোট নাগরার উপত্যকায় সেই ভগ্নদুর্গ, যা একদিন আমি দেখে এসেছিলাম পথ হারিয়ে, সেই দুর্গই দল বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি।

সরকারী পুলিশ বাহিনী আর কালবিলম্ব করল না। ইনফরমারদের সঙ্গে গিয়ে তারা ভগ্নদুর্গ আক্রমণ করল।

লড়াই চলল তীরধনু আর বন্দুকে। বেশী সময় লাগল না।

গুপ্তঘাটি সরকারী দখলে এসে গেল। কিন্তু দলের নেত্রী কখন দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে তা কেউ বুঝতে পারল না।

মনে মনে আমি পরম স্বস্তি অনুভব করলাম। প্রভূ যীশুর কাছে কেন জানিনা নতজানু হয়ে সেদিন শনিচারিয়ার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানালাম।

২৩শে মার্চ : ১৯০১

দূরে কোন আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের দ্রিম্ দ্রিম্ আওয়াজ ভেসে আসছিল। আকাশে চাঁদের আলো কত উজ্জ্বল, কেমন স্নিগ্ধ। সামনে শালের বনের প্রতিটি পাতা যেন গোণা যায় সেই আলোয়। মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল একটা উপভোগ্য বাতাস। পথের ধারের কত রকমের ফুলের গন্ধ সেই বাতাসের পাথায় জড়ান।

কোন কাজ ছিল না হাতে, বসে বসে দেখছিলাম বসন্ত রাত্রির রূপ।

হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল শালের বনের প্রান্তে দুর্গম উপত্যকা থেকে অতি কষ্টে কে যেন উঠে আসবার চেষ্টা করছে।

দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাছাকাছি হতেই চাঁদের আলোয় যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার সামনে একটি শালের গাছকে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সেই রহস্যময়ী রাজকুমারী শনিচারিয়া।

আমি কোন কিছু বলার আগেই শনিচারিয়ার মুখে ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল।

ডাক্তার জনসন, আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল।

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, কিন্তু তোমাকে ধরার জন্যে যে সবাই ওৎ পেতে রয়েছে।

আবার সেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল শনিচারিয়ার মুখে। বলল, ধরা যদি দিতে হয় ডাক্তার, তাহলে তোমার কাছেই দেব।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওর পোষাকের দিকে।

একি, তোমার কাপড় যে ভেসে যাচ্ছে রক্তে!

শনিচারিয়াকে ধরে ফেললাম। বলল, ও কিছু নয় ডাক্তার, তোমাদের লোকেরা আমাকে বসন্তে রাঙা ফুল উপহার দিয়েছে।

বললাম, এসো আমার সঙ্গে। গুলি লেগেছে কি?

ও বলল, তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাইনা ডাক্তার। চলে যাচ্ছি বহুদূর, তার আগে আমার দেশের মানুষের হয়ে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতে চাই।

ও কাঁপছিল। রক্তের পরিমাণ দেখে ওর আঘাতের গুরুত্ব যে কতখানি তা আমার বুঝতে বাকী রইলনা।

ওকে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালে। শুইয়ে দিলাম অপারেশন টেবিলে। পায়ের ভেতর দিয়ে গুলিটা চলে গেছে। ক্ষতটা গভীর, সারতে সময় নেবে।

পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন শনিচারিয়া বলল, তাহলে সত্যিই আমায় ধরলে ডাক্তার?

বললাম, যতদিন সুস্থ না হচ্ছ ততদিন এ হাসপাতালে আমার নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে। পরে আমার কাজ ফুরোলে যেখানে খুশি যেও।

পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই আমার ডিসপেনসিং রুমে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল, অল্প সময়ের ভেতরে গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

বাইরে এসে বারান্দায় বসলাম। সমস্ত ঘটনাটি আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, যার মঙ্গলের জন্যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি, সে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এসে ধরা দেবে, এ

যে একেবারেই অবিশ্বাস্য। এমনি অভাবিত বস্তু কখনো কখনো আমাদের হাতের কাছে এসে যায়। তখন মনে হয় সমস্ত ঘটনাটি যেন অলীক একটা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ঘটে যাচ্ছে।

সারারাত ঘুমল ও, আমি পাশে বসে কাটিয়ে দিলাম। ছুরিতে ডিসেক্সন করে যা দেখা যায় না কোনদিন, ওর সেই শক্তি আর শ্রীকে মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ভোরের কাছাকাছি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু তন্দ্রার ঘোর এসে গিয়েছিল, বাইরে কাদের গলার আওয়াজে উঠে বসলাম।

দেখি আমার আগেই শনিচারিয়া উঠে বসেছে। ওকে ইসারায় কথা বলতে বারণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

অনেক আগেই ভোর হয়ে গেছে। চারদিক রদ্দুরে ঝলমল করছে। হাসপাতালের সামনের পথে দেখি দুটি অশ্বারোহী পুলিশ দাঁড়িয়ে।

মুখোমুখি হতেই ওরা আমাকে অভিবাদন জানাল।

একজন বলল, ডাক্তার জনসন, কাল রাতে কি আপনি কোন স্ত্রীলোককে এ পথে যেতে দেখেছেন?

আমি বিস্ময়ের ভাণ করলাম, এ পথ দিয়ে চলে যেতে, কই না তো!

ওরা আবার অভিবাদন জানিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি সুবাদার সাহেব? আসুন, চা পান হোক।

ওরা ঘোড়া থেকে নেমে এসে বসল হাসপাতালের বারান্দায়।

বামিয়াকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললাম।

বামিয়া আদিবাসী একটি ছেলে। গত বছর আগুনে পুড়ে গিয়ে হাসপাতালে আসে। ভাল হয়ে ও আর গাঁয়ে ফেরে না, আমার কাছেই থেকে যায়। হাসপাতালের ফরমায়েস খাটে বামিয়া।

হেসে বললাম, হঠাৎ ভোরবেলা স্ত্রীলোকের খোঁজ কেন সুবাদার সাহেব?

আর বলেন কেন ডাক্তার সাব, ঐ মেয়েটার জন্তে আমাদের দিনে রাতে ঘুম নেই।

কোন মেয়ে আবার!

ঐ যে ডাকু মেয়েটা, যে আদিবাসী জানোয়ারগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। বললাম, তার জন্তে আপনাদের ঘুমের কামাই নেই কেন?

ওকে ধরতে না পারলে সোয়াস্তি নেই। বাইরে থাকলেই আবার জ্বালাবে। কোনদিক থেকে যে কি করে বসবে বলা যায় না।

বললাম, সামান্য একটা মেয়ে, তার এত দাপট। এতগুলি ঝানু জাঁদরেল পুলিশকে ভাবিয়ে তুলল।

আত্মসম্মানে মনে হল ঘা লেগেছে সুবাদার সাহেবের!

বলল, সামান্য মেয়ে হলে কি আর ধরতে সময় লাগে ডাক্তার সাব। এ মেয়েকে আপনি দেখেননি, তাই এমন কথা বলছেন।

আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই।

তা আর দেখিনি। ছাতমবুরুতে লড়াই হল, সে কি মূর্ত্তি তার। ঘোড়ায় চড়ে চোখের পলক পড়তে না পড়তে পাহাড়ের একটা বাঁক থেকে আর একটা বাঁকে চলে যাচ্ছে।

বললাম, তাহলে বেশ দক্ষ বলতে হয়।

দক্ষ বইকি। শেষে লড়াইএ হেরে গিয়ে যে পথ দিয়ে ওদের লোকজন নিয়ে নেবে গেল, আমরা তা কোনদিন ভাবতেও পারতাম না।

কোনরকমে পাকড়াও করতে পারলেন না ওকে?

চেষ্টার কসুর করিনি, কিন্তু দেখতে না দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

চা নিয়ে এল বামিয়া। ওদের চা আর কেক খাওয়ালাম। খুব খুশি।

বলল, একটা কথা বলি ডাক্তার সাব, যদি কিছু মনে না করেন।

মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এরা আবার কি কথা বলতে চায়।

মুখে বললাম, আপনারা কোন সংকোচ না রেখেই কথা বলুন। আমি কিছুমাত্র মনে করব না।

ওদের একজন বলল, পুলিশ ব্যারাকের অফিসাররা

মনে করেন, আদিবাসীদের ওপর আপনার নাকি একটু দরদ আছে।

বললাম, নিজের নিজের কাজের ওপর আকর্ষণ থাকাই তো স্বাভাবিক। আমি ডাক্তার, আমার কাছে রোগীর কোন জাত ধর্ম নেই।

ওরা দুজনেই আমার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গেল।

খাওয়ার শেষে উঠল ওরা।

বললাম, সেই মেয়েটিকে কাল রাতে দেখার কথা কি যেন বলছিলেন ?

হাঁ, আমরা ওর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, সামনের ভ্যালিটার ঐ প্রান্তে ঘোড়ায় চড়ে সে চলেছে।

সবিস্ময়ে বললাম, তাকে স্পষ্ট দেখলেন।

চাঁদের আলোয় যতটা দেখা যায়। আর দেখুন এদেশে ঐ একটি ছাড়া কোন স্ত্রীলোককে কেউ কখনো ঘোড়ায় চড়তে দেখেনি।

তারপর কি হল ?

গুলি ছুড়লাম ওকে লক্ষ্য করে। মুহূর্তে শালের বনের ভেতর মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাহলে সে এতক্ষণে নিশ্চয়ই এ বন ছেড়ে বহুদূর জঙ্গলের ভেতর পালিয়েছে।

ওরা ঘোড়ায় চড়ে ওদের পাঁচ হাজার টাকার শিকারের লোভে বনের দিকে দ্রুত চলে গেল।

ফিরে এলাম ডিসপেনসিং রুমে। এসে দেখি বিছানায় উঠে বসে শনিচারিয়া খামিয়ার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে খামিয়া লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। শনিচারিয়া সে দৃশ্য দেখে হেসেই অস্থির।

কপট গাম্ভীর্য মুখে এনে বললাম, ও আমাকে ভয় করে।

হাসি আর থামতেই চায় না শনিচারিয়ার মুখে।

আমার চেয়েও বেশী ভয় ওর? বললাম, কে তোমাকে বসতে হুকুম দিয়েছে, জান, এটা হাসপাতাল। এখানে একমাত্র আমার আদেশই পালন করা হবে।

ওর হাসি থেমে গেল। চোখমুখে অসহায় অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল। পাটা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ও।

হাসি চাপতে চাপতে বাইরে এলাম।

খামিয়াকে বললাম, খাবার দিয়ে এস ভেতরে। আর একটা কথা, ও যে এখানে আছে কেউ যেন না জানে।

খামিয়া মাথা নেড়ে চলে গেল। তের চৌদ্দ বছর বয়েস হবে ছেলেটার। যেমন সরল তেমনি বিশ্বাসী।

এ দেশের মানুষগুলো একেবারে সহজ সরল। এই ক'বছরে কেন জানিনা বড় ভালবেসে ফেলেছি এ দেশটাকে।

বাইরে বসে শনিচারিয়ার কথাই ভাবতে লাগলাম।

কি তাজা প্রাণশক্তি এই মেয়েটির। তবু শিশুর মত ভীরু। একটু কপট ক্রোধ দেখাতেই ভয়ে কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেল।

আশ্চর্য, যার ভয়ে সকলে ভীত, যার নিজের প্রাণের বিন্দুমাত্র ভয় নেই, সে একজন ডাক্তারের সামান্য কথায় ভয় পেয়ে গেল। মানুষের কি বিচিত্র রূপ।

বসে বসে ভাবছিলাম নানান কথা। খামিয়া এসে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি এক কাণ্ড। শনিচারিয়ার সামনে কেক আর দুধ রাখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সে একেবারেই ছোঁয়নি; কেবল কেঁদে চলেছে।

খামিয়াকে বাইরে যেতে বললাম। ও চলে গেলে শনিচারিয়ার কাছে গিয়ে বসলাম।

আমাকে দেখে শনিচারিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে লাগল।

বললাম, ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গেছে কখন, কেক, আর দুধটুকু খেয়ে নাও গায়ে বল না এলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে কি করে।

ও বলল, কিছুতেই ওগুলো মুখে তুলতে পারব না ডাক্তার।

ভাবলাম, আমি খৃষ্টান। কোন কোন আদিবাসী খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু গোঁড়া। তাই হয়ত শনিচারিয়া আপত্তি তুলেছে।

বললাম, দুধটুকু আপাততঃ খেয়ে নাও, ওটা বামিয়া এনেছে। তোমার আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করে দেব।

মুহূর্তে কি যেন ভেবে সামনে পড়ে থাকা প্লেট থেকে কেকটা তুলে নিয়ে ও কামড় দিল।

খেতে খেতে বলল, আমাকে ভুল বুঝনা ডাক্তার। জাতের বালাই আমার নেই। আমার বাবা ছিলেন আদিবাসী আর মা রাজপুতানী। আমি খেতে চাইনি ভিন্ন কারণে।

বললাম, যদি আপত্তি না থাকে বলতে, তাহলে খেতে না চাওয়ার কারণটা জানতে পারি কি?

খেতে খেতে খাওয়া থেমে গেল।

বললাম, কারণটা যদি দুঃখের হয় তাহলে আমি তা জানতে চাইব না শনিচারিয়া।

ও চোখ মুছে বলল, খেতে গেলেই মনে পড়ে ওদের কথা।

জঙ্গলের কত লোক না খেয়ে কাটাচ্ছে তুমি ভাবতে পারবে না ডাক্তার।

শনিচারিয়ার ওপর শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল

সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, যতদিন চিকিৎসা চলবে ততদিন আমার দেওয়া খাবার খেতে হবে শনিচারিয়া তুমি এতে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে।

এবার শনিচারিয়ার মুখে কেমন যেন ম্লান একটুকরো হাসি ফুটে উঠল, সেরে উঠে কি হবে ডাক্তার; তার চেয়ে শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল।

এ কথা কেন?

কোন দিক থেকে মানুষ যখন সফল হতে পারে না তখনই কেবল তার মনে বাঁচা মরার প্রশ্ন জাগে।

তুমি ভাল হয়ে ওঠ, একদিন তোমার সব কিছু আবার ফিরে পাবে।

আমাকে স্বার্থপর ভেবোনা ডাক্তার। আমি আমার সেই ভাঙা দুর্গটুকু ফিরে পাবার জন্যে মোটেই চিন্তিত নই। সারা বনের মানুষগুলো আজ পঙ্গু হয়ে গেল। এ দুঃখ কিছুতেই সইতে পারছি না।

বললাম, সুস্থ হয়ে ওঠ, তখন নতুন কিছু চিন্তা করা যাবে

একটা যন্ত্রণার ছায়া নেমে এল ওর মুখের ওপর।

ওকে কথান্তরে নিয়ে যাবার জন্য আজ সকালের গল্প জুড়ে দিলাম। সেই সুবাদারদের খোঁজাখুঁজির ব্যাপার।

কথায় কথায় ওর মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়ে গেল।

হেসে বলল, পাঁচ হাজার টাকার ভাগ বুঝি আর কাউকে দিতে চাও না। নিজেই সবটা নেবে?

বললাম, নিজেকে এত অল্প দামের ভাবছ কেন শনিচারিয়া। তোমার আসল দাম আমার অজানা নয়, তাই এত কম দামে কারু কাছে তোমাকে তুলে দিতে চাই না।

ও হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল কোন কথা বলল না।

আমি দরজাটি বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম আমার কাজে।

কয়েকদিন এমনি কেটে গেল। নিভৃতে গল্প করি শনিচারিয়ার সঙ্গে। এ কদিনই বুঝতে পেরেছি কি বিপুল ঐশ্বর্য ওর ভেতর রয়েছে।

আমার ডিসপেনসিং রুমের জানালাটা খুলে দিলে সামনের উপত্যকা আর তার পরের বড় পাহাড়টা স্পষ্ট চোখে এসে পড়ে।

গভীর রাতে যখন চারদিক ঘুমে ডুবে যায় তখন কোন কোন দিন আমরা দু'জনে বসে বসে গল্প করি।

টুকরো টুকরো কথার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে শনিচারিয়ার জীবনের কথা

সেদিন এমনি সে গল্পে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। কথায় কথায় বলল, ছোট নাগরার দুর্গের কথা। আর তার মৃত পিতামাতার কাহিনী।

বাবা ছিলেন আদিবাসী 'হো' সম্প্রদায়ের লোক। ছেলেবেলা খেতে না পেয়ে এই বনে মনোহরপুরের জায়গীরদার অভিরাম সিংএর বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন।

অভিরাম সিংএর একটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে ছিল বাবার চেয়ে অনেক ছোট। বাবা সেখানে

অভিরাম সিংহের আস্তাবলে কাজ করতেন। একটু বড় হলে সেই মেয়েটির সঙ্গে বাবার ভালবাসা জন্মে। দু'জনে বিয়ে করবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

কথাটা ক্রমে অভিরামের কানে যায়। অমনি তিনি এমন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন যে কোমর থেকে তলোয়ার টেনে বাবাকে আঘাত করেন। ফলে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁর একটি হাত দুখণ্ড হয়ে যায়।

অভিরামের রাগ পড়লে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। বাবাকে স্নেহ করতেন খুব। তাড়াতাড়ি লোক দিয়ে রাঁচিতে পাঠিয়ে দেন চিকিৎসার জন্যে। তোমাদের দেশীয় এক ডাক্তার সেখানে বাবাকে সুস্থ করে তোলেন। তিনি নিজের দেশে ফিরছিলেন, বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

কয়েক বছর বিদেশে কাটিয়ে বাবা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরে নিজের জঙ্গল আবাসেই তিনি ফিরে আসেন।

ফিরেই দেখা করতে যান অভিরাম সিংএর সঙ্গে।

অভিরাম তখন মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা তারাবাঈ বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

কিন্তু সরকার তারাবাঈকে সম্পত্তির অধিকার দিল না। তারা কৌশলে সমস্ত মহাল খাস করে নিল।

বাবার সঙ্গে গভীর জঙ্গলে চলে এলেন তারাবাঈ। সঙ্গে আনলেন, বহুদিনের সঞ্চিত সোনা। বিয়ে হল দুজনের। ছোট নাগরায় বাবা বসতি পত্তন করলেন। পাথর সাজিয়ে সাধারণভাবে গড়ে তুললেন দুর্গ। গড়লেন 'গরাম' দেবতার মন্দির। ধীরে ধীরে জঙ্গল মাহালের প্রায় সমস্ত হো'দের তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। তাদের ভেতর জাতীয়তার মন্ত্র দান করলেন।

নিজের ধর্মের ভেতর দিয়ে ভগবানকে পাবার চেষ্টা করবে। ভগবানের রাজ্যে জাতির বিচার নেই। অন্যায় সহ্য করবে না। জঙ্গলের লোকেরা বাবাকে তাদের রাজা বা দেবতা বলে মনে করত।

বাবা অত্যন্ত মুক্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের তদারকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন।

কিন্তু প্রকৃতি বাদ সাধল এক সময়। পাহাড় হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠল। ছোটনাগরার দুর্গ ভেঙে পড়ল। তার একটি স্তূপের ভেতর আমার বাবা, মা সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল শনিচারিয়া। একটা গভীর বেদনাকে প্রাণপণ শক্তিতে চেপে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

ও প্রসঙ্গে ছেদ টেনে দিয়ে আমি বললাম, প্রথম যেদিন আমি তোমাকে দেখি সেদিন কিন্তু আদিবাসী বলে ভুল করিনি।

শনিচারিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠল হঠাৎ, আমি আদিবাসীর মেয়ে ডাক্তার জনসন। আমার দেহে আদিবাসীরই রক্ত বইছে। আমার ধর্ম আর আমার এই জংলী দেশকেই আমি ভালবাসি।

বললাম, আমি সেজন্যে তোমাকে শ্রদ্ধা করি শনিচারিয়া। আমাকে ভুল বুঝ না।

সহজ হল শনিচারিয়া। আমার হাতটা টেনে নিয়ে বলল, তোমাকে দেখে ইংরাজের ওপর সব অশ্রদ্ধা দূর হয়ে যায় ডাক্তার। আমার বাবাও তোমার মত দয়ালু এক ইংরাজ ডাক্তারের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

যত তাড়াতাড়ি পায়ের ক্ষতটা সেরে উঠবে মনে করেছিলাম; তা আর হল না। শনিচারিয়াকে বেশ কিছুদিন ভুগতে হবে বলেই মনে হল।

মাঝে মাঝে ও অস্থির হয়ে উঠত। বনে বনে রাত্রিদিন ঘুরে বেড়ানই যার স্বভাব, কতকাল ছোট্ট একটি বেডের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা যায়।

এক একদিন শনিচারিয়া হাঁপিয়ে উঠত।

বলত, কতদিনে সারব ডাক্তার ?

বুঝিয়ে বলতাম, আঘাতটা গুরুতর তাই সারতে একটু সময় লাগছে।

অনুনয় করত, আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যেতে পারবে ডাক্তার। কতদিন চারদিকটা ভাল করে দেখিনি। শালের ফুল ফুটেছে। 'বাহা' পরবের ঢেউ উঠেছে সারা বন জুড়ে। আমার মন কেমন করছে ডাক্তার।

গভীর রাত। চাঁদের আলোয় বন, পাহাড় ভেসে

যাচ্ছে। ওকে সাবধানে ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালের বাইরে।

কতক্ষণ একটি পাথরের চাঁইএর ওপর বসে রইলাম দুজনে। ও কতদিন পরে চারদিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল। আপন মনে মগ্ন হয়ে গেল।

বহুদূর থেকে মাদলের ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে আসছিল। শনিচারিয়া কান পেতে সেই শব্দটুকু শুনতে লাগল। তারপর এক সময় নিজেই ধীরে ধীরে গাইতে লাগল 'বাহা' পরবের গান।

সেই জ্যোৎস্নার জলে ধোয়া বন পাহাড়ের রহস্যময় পরিবেশে সে সুর চারদিকে আশ্চর্য স্বপ্নের জাল বুনতে লাগল। আমি মুগ্ধ হয়ে সেই অরণ্যকন্যাকে দেখতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আর ধর্ম নিয়ে আলোচনা হত। আমি ওকে প্রভু যীশুর ত্যাগের কথা বোঝাতাম। কথায় কথায় আদিবাসীদের বিচিত্র সংস্কার আর দেবতার কথা এসে পড়ত।

শনিচারিয়া বলত, আমি জানি ডাক্তার, আমাদের ধর্মবোধের ভেতর অনেক কুসংস্কার আছে। কিন্তু নিজের ধর্মের চেয়ে অন্য কোন ধর্মকে আমি বড় বলে ভাবতে শিখিনি।

বলতাম, তোমার মুক্ত মনের কাছে এটা একটা সংস্কার বলেই আমি মনে করি। ও অমনি বলত, তোমার ধর্মও একেবারে কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয় জনসন। তাই খৃষ্টানরাও কিছু পরিমাণে সংস্কারাচ্ছন্ন।

এ তোমার তর্কের কথা হল শনিচারিয়া। ও আবার নীরব হয়ে যেত। কতক্ষণ ভাবত। তারপর বলত; প্রতি জাতির ধর্ম গড়ে ওঠে বহুদিনের সাধনা আর সংস্কারে। এক একটি জাতির কাছে তার ধর্ম তার একান্ত প্রাণের বস্তু। আমার মনে হয় কি জান, নিজের নিজের ধর্মকে ধীরে ধীরে সংস্কার করে নিলে তার ভেতর দিয়েই ঈশ্বরের সহজ রূপটি দেখা যায়।

প্রভু যীশুর প্রতি সম্পূর্ণ অনুরক্ত থেকেও শনিচারিয়ার কথাকে অস্বীকার করতে পারতাম না।

নানা আলোচনার ভেতর দিয়ে এই অরণ্য কন্যাটি ধীরে ধীরে আমার সমস্ত মনকে অধিকার করে বসল। আমার দিন, আমার রাত্রি, আমার সমস্ত ভাবনা কল্পনা এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হতে লাগল।

শনিচারিয়ার বিপুল সত্তার মধ্যে আমি ধীরে ধীরে মগ্ন হয়ে গেলাম।

কয়েকদিন পরে এক দুপুরে হাসপাতালের বারান্দায় বসে আমাদের কথা হচ্ছিল। বললাম, ডাক্তার হয়ে বলব তোমার অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যাক্, কিন্তু আমার ভেতর আর একটা মানুষ বলছে, অসুখ সারলেই ও পালাবে। যে কটি দিন ও হাসপাতালে বন্দী থাকে সে কটি দিনই লাভ।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল শনিচারিয়ার মুখে। বলল, খাঁচার ভেতর যে পাখি কিছুকাল বন্দী হয়ে থাকে, খাঁচা মুক্ত করে দিলেই কি সে উড়ে যেতে পারে ডাক্তার।

কথা শেষ করেই শনিচারিয়া বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল। হাতের ইসারায় আমাকে পথের দিকে ইংগীত করে ও সরে গেল দ্রুত।

দেখলাম, ঘোড়ায় চড়ে হাসপাতালের দিকে কে যেন আসছে।

কাছে আসতেই দেখলাম রেবেকা। এগিয়ে গেলাম।

কি ব্যাপার, আপনি এ সময়, একা!

রেবেকা ঘোড়া থেকে নেমে হাঁপাতে লাগল।

সময় নেই আমার ডাক্তার জনসন। জীবনে অনেক উপকার করেছেন আপনি, তাই যদি আপনার কোন উপকার হয়, সে জন্যে দৌড়ে এলাম।

বললাম, হাঁপাচ্ছেন আপনি, বসুন এখানে।

রেবেকা বসলেন না। বললেন, এখুনি ফিরে না গেলে সবাই আমাকে সন্দেহ করবে। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।

আমি তাকিয়ে রইলাম রেবেকার দিকে।

রেবেকা বললেন, সেই আদিবাসী মেয়েটিকে কারা যেন আপনার সঙ্গে রাতে এই পাহাড়ের ওপর দেখেছে। তারা সরকারকে খবর দিয়েছিল। আজ শেষ রাতে

পুলিশের লোকেরা আপনার হাসপাতাল ঘেরাও করবে। সাবধান থাকবেন ডাক্তার জনসন।

রেবেকা কথা ক'টি বলেই ঘোড়ায় চড়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বসে বসে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম। গোপনতা কেন, আজ যদি ওরা আসে তাহলে শনিচারিয়াকে নিয়েই বের হব ওদের সামনে। যদি কোন সেবা করে থাকি সরকারের, তাহলে তার পুরস্কার স্বরূপ চেয়ে নেব এই অরণ্য কন্যাটিকে। ওকে নিয়ে আমার দেশে চলে যেতে আশা করি ইংরাজ সংকার বাধা দেবে না। তাহলে এই সারান্দার মানুষগুলোকে ক্ষেপিয়ে তোলার যে ভয়, তা আর থাকবে না সরকারের।

শনিচারিয়াকে কিছু বললাম না। রেবেকা আর আমার কথাগুলো বোধ করি শোনেনি শনিচারিয়া। তাহলে গভীর চিন্তায় ডুবে আছি দেখেও এমন হাসি মুখ নিয়ে ও আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারত না।

শনিচারিয়া বলল, কতদিন ফুল পরিনি খোঁপায়। আজ খোঁপা বাঁধব, তুমি একটু শালের ফুল এনে দেবে।

ফুল এনে দিলাম। আজ অপরূপ করে নিজেকে সাজাল শনিচারিয়া।

রাতে খেতে বসলাম একই সঙ্গে। ও আমাকে পরিবেশন করতে লাগল। ওর চোখে মুখে আজ যেন কিসের তৃপ্তি উপচে পড়ছে।

আমিও মনে মনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

শুতে যাবার সময় ও আজ এল আমার কাছে।

বলল, তুমি ঘুমাও ডাক্তার, আমি তোমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিই।

ও বসে বসে বিলি কাটতে লাগল। কি যাদু ও হাতের। আমি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা ভারী জিনিষ ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। ল্যাম্প জেলে ঢুকলাম শনিচারিয়ার ঘরে। ঘর শূণ্য। বেরিয়ে এলাম পথের ওপর। অন্ধকার রাত। আলো নিয়ে খুঁজতে লাগলাম। ঐ ত, শনিচারিয়া পড়ে আছে পথের ওপর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পথ। হাসপাতালের পেছনে খাড়াই পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও।

তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে নিলাম ওর দেহটা। পরীক্ষা করে দেখলাম, শেষ অবস্থায় এসে পৌছেছে।

কেন, এমন করলে শনিচারিয়া। থর থর করে আমি কাঁপতে লাগলাম।

তোমাকে আমার খু-উ-ব ভাল লাগে। অস্পষ্ট কথার স্বর।

তোমাকে বিয়ে করে আমার দেশে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম শনিচারিয়া।

তোমার দেশে!

হাঁ, শনিচারিয়া আমার দেশে। যন্ত্রণার ভেতরেও হাসতে চেষ্টা করল শনিচারিয়া। একেবারে কাছে আমার মুখটা নিয়ে যেতে ইংগীত করল।

তারপর বলল, আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করলাম ডাক্তার। শুধু কথা দাও তুমি আমার ধর্মকে ঘৃণা করবে না।

ওর হাতখানা আমার দুটি হাতের মধ্যে তুলে নিলাম।

ও নীরব হয়ে গেল। অন্ধকার সরে গিয়ে পাহাড়ের আড়ালে আবির্ভাব হচ্ছে জ্যোতির্ময় আলোর। আমি নতজানু হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

আপনি ডাক্তার জনসনের ডায়েরী পড়া শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াবেন, তখন ঐ বৃদ্ধ পাদ্রীটি আপনার সামনে এসে আদিবাসীদের বৃক্ষদেবতা 'জায়েরী'র দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তারপর আপনার হাত থেকে ঐ ডায়েরীখানা নিয়ে মৃদু হাসি হাসতে হাসতে ঢুকে যাবেন চার্চের ভেতর।

ফিরে আসতে আসতে আপনার মনে হবে ইনিই কি ডাক্তার জনসন। আমারও তাই মনে হয়েছিল।

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

—"নিজেকে খুব চতুর মনে করো না। বেশী চতুর মনে করা ভাল নয়। যেমন কাক খুব চতুর, নিজেকে খুব চতুর মনে করে, কিন্তু বিষ্ঠা খেয়ে মরে, তেমনি এ সংসার-ক্ষেত্রে যারা বেশী চালাকী করতে যায়, কেবল তারাই ঠকে মরে। মানুষের মন যেন সরসের পুঁটুলি। সরসের পুঁটুলি একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হয়ে ওঠে, তেমনি মেয়ে মানুষের মন একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে তখন স্থির করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। বালকের মন ছড়ায়নি, অল্পতেই স্থির হয়; কিন্তু বুড়োদের ষোল আনা মন সংসারে ছড়িয়ে রয়েছে, সংসার থেকে মন তুলে ঈশ্বরে স্থির করা বড় শক্ত। কামিনী কাঞ্চনে মন থাকলে ছড়ানো মন কুড়ান দায় হয়ে ওঠে।"

*　　*　　*　　*

—"বড়লোকের বাড়ীর ঝি চাকর কাজ করবার সময় ভাবে সবই মনিবের কাজ, নিজের কিছুই নয়; তেমনি সংসারে থেকে কাজ করতে করতে মনে করবে সবই তার (ভগবানের) কাজ, নিজের বলতে কিছুই নাই। এইভাবে তার উপর নির্ভর করে কাজ করার নামই কর্ম্মযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম, জপ ও ধ্যান করা এবং ঐ ভাবে সকল কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে পথ। সংসারে থেকেও ঈশ্বরের আরাধনা চলে। এদেশে দেখেছি, সব চিড়ে কোটে; একজন স্ত্রীলোক এক হাতে ঢেকির গড়ের ভিতর হাত দিয়ে নাড়ছে, আর এক হাতে ছেলে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াচ্ছে। ওর ভেতর আবার খদ্দের আসছে, তার সঙ্গে হিসাব করছে, তোমার কাছে ওদিনের এত পাওনা আজকের এত দাম হলো। এই রকম সে সব কাজ করছে বটে, কিন্তু তার মন সর্ব্বক্ষণ ঢেঁকির মুষলের উপর পড়ে আছে; সে জানে যে, ঢেঁকিটি হাতে পড়ে গেলে জন্মের মত হাতটি যাবে। সেই রূপ সংসারে থেকে সকল কাজ কর, কিন্তু মন রেখো তার (ভগবানের) প্রতি। তাঁকে ছাড়লে সব অনর্থ ঘটবে।"

*　　*　　*　　*

—"যত মত তত পথ। সর্ব্ব ধর্ম্মই সত্য। এক একটি ধর্ম্মের মত এক একটি পথ, ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে। যেমন নদী নানাদিক থেকে এসে সাগর-সঙ্গমে মিলিত হয়। নানা ধর্ম্ম, নানা পথ এক ঈশ্বরের কাছে পৌছবার মত পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। সব মতই পথ—কত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে, একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌছনো যায়। তবে কোন পথ শুদ্ধ কোন পথ নোংরা, শুদ্ধপথ দিয়ে যাওয়াই ভাল। যেমন ছাদে যেতে পাকা সিঁড়িতে ওঠা যায়, কাঠের সিঁড়ি, বাঁশের মই, বাঁকা সিঁড়ি, একটা বাঁশ বা একটা দড়ি এর সাহায্যেও ওঠা যায়, তবে একটা জোর করে ধরতে হয়, এতে এক পা, ওতে এক পা দিলে হয় না। একটাতে দৃঢ় হলে ঈশ্বর লাভ হয়. নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকার বাদীরাও ঈশ্বর লাভ করবে, নিরাকার বাদীরাও ঈশ্বর লাভ করবে। একই জল পান করে থাকে সকলে। জল এক বস্তু, কিন্তু নাম বিভিন্ন। সেইরূপ ঈশ্বর এক বস্তু কিন্তু নাম অনেক আছে। যে কোন একটা নাম ধরে ডাকলেই তিনি দেখা দেন।"

ভারতী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বাঙলার সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অনুশীলনে ভারতী পত্রিকার বিশিষ্ট একটি স্থান আছে। বঙ্গদর্শনের ন্যায় ভারতী-পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল সাংস্কৃতিক আদর্শ নিয়ে। বঙ্গদর্শন এবং ভারতী—এ দুখানি পত্রিকার উদ্দেশ্যের মূলে ব্যবসাদারী প্রবৃত্তি ছিল না ; এজন্য ভারতীর ইতিহাস বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশ স্বরূপ যদি বলি, তাহলে অত্যুক্তিদোষ ঘটবে না।

ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগেকার কথা বলছি—তখন আমরা স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে, থার্ড ক্লাসে পড়ি—পাঠ্যগ্রন্থ ছাড়া আমাদের অবসর-বিনোদন বা মনোবিকাশের জন্য কোনো গ্রন্থ ছিল না। বাড়ীতে মাসে মাসে আসতো ভারতী পত্রিকা—সেই ভারতী পত্রিকায় পড়তুম রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতা গল্প উপন্যাস এবং বিচিত্র মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। সেইসব রচনা পড়ে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে হয় আমাদের পরিচয় সুরু। কাজেই ভারতী পত্রিকার দৌলতেই আমাদের অনেকের সাহিত্যসাধনা সুরু হয়—আমরা কজন সতীর্থ সুহৃদ কবিতা ও গল্প লেখার প্রেরণা পেলুম।

কিন্তু এইটিই বড় কথা নয়। ভারতী আমাদের মনের রুদ্ধ কপাট খুলে স্বপ্নরাজ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটালো—ইতিহাস-বিজ্ঞানের বহু তথ্য আমরা জানতে পারলুম ভারতীর বিচিত্র রচনাবলী থেকে।

স্কুলের পাঠ্য ইতিহাস পড়ে সিরাজদ্দৌলাকে জেনেছিলুম নিষ্ঠুর কদাচারী মানুষ বলে—মীরকাশিমকে জেনেছিলুম—নবাবীর প্রত্যাশী বলে ; কিন্তু এই ভারতী পত্রিকায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বহু নথিপত্র দলিলদস্তাবেজ থেকে সিরাজ এবং মীরকাশিমের সত্য পরিচয় ধরে দিয়েছিলেন দেশের সামনে। এই ভারতী পত্রিকাতেই ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখে-ছিলেন ত্রিপুরার ইতিহাস। সেই রচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন কিশোর বয়সে তাঁর রাজর্ষি উপন্যাস। পরে এই রাজর্ষিকে তিনি করেন 'বিসর্জন' নাটকে রূপান্তরিত। 'বিসর্জন' বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের শিরোভূষণ বললে অত্যুক্তি হবে না।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর

দেশে তখন তেমন পাঠক সৃষ্টি হয়নি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধ্য-সাধন সত্ত্বেও পাঠকের রুচি তেমন বলিষ্ঠ হয়ে গড়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্র নিরাশ হয়ে বঙ্গদর্শন বন্ধ করেছেন—প্রচার, নবজীবন, বান্ধব এই কখানি পত্রিকা কোনোমতে আত্মপ্রকাশ করছিল। এমন সময় ভারতীর আবির্ভাব।

কি কারণে আবির্ভাব—সে কাহিনী বেশ বিচিত্র। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ভারতীর প্রথম আবির্ভাব।

কি করে আবির্ভাব হলো, সে সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—আমি তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর তেতলায় বাস করতুম। তেতলার ঘরের সংলগ্ন একটা প্রকাণ্ড ছাদ—ছাদে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টবে পোঁতা ঝাউ, নারিকেল প্রভৃতি উদ্যানসুলভ খুব বড় বড় গাছ। গাছগুলো কোথাও বা কুঞ্জের মতো পুঞ্জীভূত করে, কোথাও বা সারি-সারি সাজিয়ে, কোথাও বা লতাবিতান তৈরী করে

ছাদটাকে এমনি উদ্যানে পরিণত করেছিলুম। আর কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল, শ্যামা, ভীমরাজ প্রভৃতি নানা-রকম গায়ক বিহঙ্গ আমার ছিল। তাদের কলকূজনে কুহুতানে ঝঙ্কারে ছাদটা অষ্টপ্রহর মুখরিত থাকতো। আর নানাপ্রকার সুরভি ফুলের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হতো। জায়গাটা ভারতী-সেবার পক্ষে কেমন অনুকূল, তা বেশ বুঝতেই পারছেন!···দোতলার যে ঘরটিতে আমি থাকি, সে ঘরটিতে একটি গোল টেবিল এবং তার চারিধারে গোলাকার চৌকি আর দেয়ালের গায়ে একটা পিয়ানো ছিল। রবি (বালক-কবি তখন বিশ্ব-কবি হননি) আমার নিত্যসঙ্গী; আর এক কবি আমার বাল্যবন্ধু অক্ষয় (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী বিখ্যাত কবি এবং এটর্ণি; তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণী হলেন 'শুভবিবাহ'-রচয়িতা) মধ্যে মধ্যে এসে জুটতেন। আমরা তিনজনে এই টেবিলের চারিধারে বসতুম—কত গালগল্প হতো, কত কবিতাপাঠ হতো, কত গান-বাজনা হতো, কত গান রচনা হতো, তার ঠিকানা নেই! পাখীর গানে ছাদটা যেমন মুখরিত হতো, এই দুই কবি-বিহঙ্গের গানে ও কবিতা-পাঠে বৈঠকখানাটাও তেমনি প্রতিধ্বনিত হতো!

কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

তিনি লিখেছেন,—একদিন প্রাতে এই টেবিলে বসে আমরা সাহিত্যালোচনা করছি, কি শুভক্ষণ আমার হঠাৎ আমার মনে হলো, এই দুই কবি-বিহঙ্গ কেবল আকাশে-আকাশেই ভেসে বেড়াবে, এদের মধুর গান আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে—লোকালয়ের কোনো কুঞ্জকুটীরে ওরা যদি আশ্রয় পায়—কিম্বা নীড় বাঁধতে পারে, তাহলে কত লোক ওদের স্বরসুধা পান করে কৃতার্থ হয়। এই কথা মনে হবা মাত্র দোতলায় নেমে গেলাম। দোতলার দক্ষিণদিককার বারান্দায় আর একটি প্রবীণ বিহঙ্গ-রাজের আসন ছিল (ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। তাঁর সুললিত অপূর্ব্ব স্বরলহরীতে আমাদের তিনি মাতিয়ে তুলেছিলেন। ···আমার প্রস্তাব শোনাবামাত্র তিনি রাজি হলেন আর তখনি দেবী 'ভারতী'কে আবাহন করে তাঁরই পুণ্যকুঞ্জে নবীন কবি-বিহঙ্গম-দের জন্য একটি নীড় বেঁধে দিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রিকার নামকরণ করলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ—ভারতী। কেন এ নাম, পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্যই বা কি, প্রথম সংখ্যা ভারতীতে ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ বেশ বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণী স্থলে স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলনই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে বিদ্যার দুই অঙ্গ—জ্ঞান অন্বেষণ এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বক্তব্য এই যে,—জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া

যায়, তাহাই নতমস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাতমানসে নহে। যে সকল বস্তু উপার্জ্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি ; কিন্তু ভাব তাহার মধ্যে হইতে পারে না। আমাদেরও বিশ্বাস এই যে ভাবের উদয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের স্ফূর্ত্তি সম্ভবে, কিন্তু উপার্জ্জন সম্ভবে না। ···স্বদেশ হইতে যে ভাব উদয় হয়, তাহাই ঠিক। যে-ভাব অন্যত্র হইতে যাচিয়া আনা হয়, তাহা কৃত্রিম, তাহা কোনো কার্য্যেরই নহে। বীণাপাণির হস্তে বীণাই শোভা পায়, হার্প কি শোভা পায় ? এই সকল কারণে ভাবের আলোচনা আমরা স্বদেশীয় ভাবেই করিতে ইচ্ছুক।

দ্বিজেন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন—যে কারণে ব্রিটানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রিটানিয়া—এথেন্স নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিনার্ভা-এথেনিয়া নাম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী—ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। আর্য্য ভাষার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। যতপ্রকার বিদ্যা আছে—গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ণ, চিকিৎসা, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিদ্যাসমূহের বীজ প্রথমে ভারত-ভূমিতেই অঙ্কুরিত হয়, পরে তাহার বীজ নানা দেশে বিকীর্ণ হইয়া এতদিন পরে তবে তাহা সাধারণ জনগণের ভোগায়ত্ত হইয়াছে।···তাই সর্ব্ববিদ্যার অধিদেবতাকে আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি।

তারপর তিনি লিখেছেন—আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আবাহনপূর্বক এই তো প্রতিজ্ঞা করিলাম—এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন, ভারতীর আশীর্বাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ভারতীর প্রথম আবির্ভাব ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে এবং বহু প্রতিভাশালী কবি, কথাশিল্পী, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানবিদ, চিন্তাশীল সমালোচক ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী—এঁরা নিয়মিত লিখতে লাগলেন। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, রামদয়াল সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রভৃতি অর্থাৎ তখনকার সুধী এবং চিন্তাশীল প্রত্যেকেই ভারতীর সেবায় যে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, সে সব পুষ্প বাঙলার সাহিত্যকাননকে অজস্র শোভামাধুরীতে সমৃদ্ধ করলেন। ভারতীতে নব নব বৈচিত্রের সমাবেশ—কবিতা, উপন্যাস, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্যালোচনা একালের মতো নাট্যালয়ের সমালোচনা হেঁয়ালি নাট্য, খেয়াল গান প্রভৃতি বাঙলা মাসিক সাহিত্যে ভারতীই সর্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করে। আচার্য্য কমল ভট্টাচার্য্য প্রায় প্রতি মাসে নানা বিষয়ে লিখতেন। সম্পাদকের বৈঠকে যে চিন্তাশীলতা এবং ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাই, তা অপূর্ব্ব।

এখনকার বহু মাসিকে নানা বিভাগ সন্নিবিষ্ট হচ্ছে—ভারতী পত্রিকা বহুযুগ পূর্ব্বে এমনি নানা বিভাগ নির্দিষ্ট ক'রেছিল।

প্রথম যুগের ভারতীর পৃষ্ঠা শেষে বিষয় বৈচিত্র্যের একটু নমুনা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। সম্পাদকের বৈঠকে বায়রণের কয়েকটি বাণী প্রকাশিত হয়েছিল। তার একটি যশের যন্ত্রণা। বায়রণের বাণী—কোনো গ্রন্থ জনসমাজে সমাদৃত হইলে তাহার লেখক চিরকালের জন্য অসুখী হবেন। ইহাতে তাঁহার যশঃ-তৃষ্ণা এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে তাঁহার মন হইতে শান্তি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়। তাঁহার একটি গ্রন্থ জনসমাজে আদৃত হওয়ায় তিনি উৎসাহিত হইয়া আরও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিতে সচেষ্ট

হবেন। লোকের প্রত্যাশা যে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্তী গ্রন্থগুলি আরও উৎকৃষ্ট হইবে এই জন্য নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। কারণ লেখকের আশা এত উত্তেজিত হয় যে তাহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ আজকালের এইরূপ ধরণ যে, গ্রন্থকারের একটি রচনাও যদি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর তাঁহার রক্ষা নাই—ইঁহার পূর্বরচিত যদি ৫০ খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ থাকে, তথাপি একটি নিকৃষ্ট গ্রন্থ তাঁহার পূর্বকীর্ত্তির অপলাপ করে।

সাহিত্যে দুর্নীতি-প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—গ্রন্থের আলোচিত বিষয়ের উপর তাহার নীতি নির্ভর করে না, রচনা-প্রণালীর উপরে করে। পাঠকের মনে দুর্নীতভাব উৎপন্ন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হইলে নিশ্চয়ই গ্রন্থ দুর্নীত। গ্রন্থকারের মনের ভিতরকার উদ্দেশ্য অন্তর্যামী জানিতে পারেন, তবে গ্রন্থে যে উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত থাকে, আমরা তাহারই কথা বলিতেছি। সাধারণ নাট্যশালার অভিনয় সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ভারতীতে প্রকাশিত মন্তব্য—নাট্যশালাধ্যক্ষেরা নিশ্চিত জানিবেন যে ভালো অভিনয় হইলে দর্শকগণের সন্তোষজনক হইবে না, ইহা অসম্ভব। যদি দর্শকদিগের রুচি এতই বিকৃত হইয়া থাকে, তাঁহাদের দোষেই হইয়াছে এবং তাঁহাদের হস্তে তাহার সংস্কারের ক্ষমতা আছে।

আর একটি প্রবন্ধে বাঙলা সাহিত্যকে সাহিত্যের রেলগাড়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সমালোচকদের বলা হয়েছে সাহিত্য-রেল কোম্পানির কর্মচারী। বিনাটিকিটে ইঁহারা সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ করিতে পারেন। ইঁহারা চিরদিন পরের টিকিট সমালোচনা করিয়াই জলযোগ করিতেছেন—একখানি টিকিটও ক্রয় করেন নাই। ইহা কি সত্য নয় যে তিনি নিজে আপনাকে যত বড় ব্যক্তিই মনে করুন না কেন, যতক্ষণ না তিনি ট্যাঁকের পয়সায় টিকিট কিনিবেন, ততক্ষণ তিনি চতুর্থ শ্রেণীর আরোহী অপেক্ষাও অধিক সম্মান পাইবার যোগ্য নন। কিন্তু এই সমালোচকগণ যে বিনা পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রেতাদিগের সম্মুখে সবখানি আসন পাইয়া থাকেন, ও অহঙ্কারে এতখানি ফুলিয়া উঠেন যে পাঁচটা আরোহীর জায়গা একা জুড়িয়া বসেন, ইহা সর্বতোভাবে ন্যায় বিরুদ্ধ। সাহিত্যের এক শ্রেণীর সমালোচকদের সম্বন্ধে এ-কথা কতখানি খাটে, সকলেই তা উপলব্ধি করবেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদনা করেছিলেন সাত বৎসর; তারপর তাঁর সুযোগ্যা ভগ্নী প্রতিভাময়ী স্বর্ণকুমারী দেবী নিলেন ভারতীর সম্পাদনা-ভার। এ সাত বৎসর দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকলেও স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী লিখেছেন—বড়মামা সম্পাদক ছিলেন নামে—কিন্তু আমার নতুনমামা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) এবং রবিমামা ভারতী চালাইতেন। তিনি লিখেছেন, রবিমামা বিলাতযাত্রা করিবার পর নতুনমামার স্কন্ধেই সম্পূর্ণভাবেই সম্পাদন-ভার পড়িল—তখন তাঁহার একজন প্রধান সহায়ক হইলেন মাতৃদেবী (স্বর্ণকুমারী দেবী)।

ভারতী পত্রিকায় স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস "দীপনির্বান" যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় তখন তাতে লেখিকার নাম ছিল না—উপন্যাসখানি তখনকার বিদ্বৎসমাজে খুব সমাদর লাভ করেছিল—দীপনির্বাণের পর তাঁর ছিন্নমুকুল, গাথা (কাব্যগ্রন্থ), মালতী, কাহাকে প্রভৃতি উপন্যাস ভারতীতে প্রকাশিত হয়—সাহিত্যে বাঙ্গালী মহিলা লেখিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীদেবীর আসন আজও সবার উপরে!

বঙ্গদর্শন বাঙলার কথাসাহিত্যকে সৃষ্টি এবং পরিপূর্ণ করেছিল—তার উপর ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির অনুশীলনের পথ নির্মাণ করেছিল, ভারতী বাঙলার কথাসাহিত্যকে অপরূপ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ করেছে ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি অনুশীলনের পথকে শুধু সুগম করেনি, সে পথে বহু পথিককে আলোকবর্ত্তিকা ধরে অগ্রসর করেছে। বাঙলার গীতিকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে ভারতীর দৌলতে। বিহারীলাল

চক্রবর্ত্তী, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় বড়াল, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কবির সঙ্গে পাঠকসমাজের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ভারতী। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ভারতীর কুঞ্জ থেকে আত্ম প্রকাশ করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনার গুণে বহু নবীন লেখকের সৃষ্টি হয়েছে এবং আজ যে বহুপ্রতিভা-শালিনী লেখিকার রচনাসম্ভারে বাঙলা সাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়েছে, এর মূলে স্বর্ণকুমারীর প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ প্রেরণা—সে সম্বন্ধে ভুল নেই। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, এঁরা স্বর্ণকুমারী দেবীর হাতে নিজেদের প্রতিভা-বিকাশের অসামান্য সহায়তা লাভ করেছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী

১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ নিলেন ভারতীর সম্পাদনাভার। তাঁর হাতে ভারতীর শ্রী যে-ভাবে ফুটেছিল, বাঙলার মাসিক সাহিত্যে তার তুলনা নেই। তাঁর হাতে ভারতীর আকার হলো ডবল-ক্রাউন সাইজে। তিনি এক বৎসর মাত্র ভারতীর সম্পাদনা করেন, তারপর সম্পাদনার ভার নিলেন স্বর্ণকুমারীদেবীর সুযোগ্য কন্যা সরলা দেবী। তখন মাসিকপত্র বাঙলা মাসের যে কোনো তারিখে প্রকাশিত হতো—সরলা দেবী প্রথমে ভারতীর প্রকাশ মাসের পহেলা তারিখে সুনির্দিষ্ট করলেন। তাঁর হাতে ভারতী বেরুতে লাগলো—ঘড়ির কাঁটার মতো প্রতি বাঙলা মাসের পহেলা তারিখে এবং তিনি ভারতীতে রাজনীতির আলোচনার প্রবর্তন করলেন। বলা বাহুল্য, তখন থেকেই মাসিক পত্রে দেশের কথার আলোচনা সুরু হলো।

সরলা দেবী ভারতীর সম্পাদনা করেন ১৩০৬ থেকে ১৩১৪ সাল পর্য্যন্ত। ভারতীর মারফৎ দেশে জাতীয়তাবোধ দেশাত্মবোধ এবং আত্মমর্যাদাবোধ যেভাবে তিনি জাগিয়ে তুললেন, শুধু বাঙলার নয়, ভারতের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। সে ইতিহাস বলে ভারতীর প্রবন্ধ শেষ করবো।

দেশে তখন শাসক ইংরেজ-জাতের দম্ভ এবং স্পর্দ্ধা এমন তুঙ্গসীমাসীন যে অনেক ইংরেজ এদেশী মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না! তাদের নিগ্রহে সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণ দেশী মানুষ জনের প্রাণ এবং মান রীতিমত বিপর্য্যস্ত। ট্রেনে-ট্রামে, পথে-ঘাটে দেশী মানুষজনকে তারা অহেতুক পীড়ন করতো। গোরার সবুট পদাঘাতে যত্রতত্র বহু নিরীহ দেশী মানুষের 'প্লীহা' বিদীর্ণ হচ্ছে এবং বিচারালয়ে গোরা-হাকিমের বিচারে আসামী-গোরা দু-দশ টাকা জরিমানা দিয়ে রেহাই পাচ্ছে। এ-ব্যাপার নিয়ে দেশী সংবাদপত্রে শুধু কান্নাকাটি চলেছে—তখন সরলা দেবী নারী হয়ে এ নিগ্রহের বিরুদ্ধে সতেজে জেহাদ ঘোষণা করলেন এই ভারতী মারফৎ।

১৯০১ সালের একটি ঘটনা; তখন খিদিরপুর ট্রাম লাইনে চলতো এঞ্জিন ট্রাম অর্থাৎ ছোট এঞ্জিনে আঁটা থাকতো দুখানি ট্রেলার—ফার্ষ্ট ক্লাস, থার্ড ক্লাসের বালাই ছিল না, সব এক ক্লাস! সেদিন অফিস টাইমে এ লাইনের এক ট্রামে দুখানি ট্রেলার যাত্রী ভরতি—ট্রাম ছাড়ে-ছাড়ে, এমন সময় ডকে কাজ করা এক 'কালো সাহেব' তার নাম অগাষ্টিন—এই ট্রামে উঠলো বসবার জায়গা নেই। 'সাহেব' দেখে কোনো 'নেটিভ' যাত্রী উঠে জায়গা দিলেনা—সাহেব তখন এক বেচারী কেরাণীবাবুকে টেনে তুলে তার আসন দখল করতে

উদ্যত। কেরাণীবাবুর নাম শরৎ চক্রবর্ত্তী। তিনি রুখে উঠলেন—কেন উঠবো? বিনা টিকিটের যাত্রী নই! নেটিভের এমন স্পর্দ্ধা! সাহেব তখন তাঁর অঙ্গে সবুট-পদাঘাত চালাতে লাগলো! লাথির পর লাথির ঘায়ে শরৎবাবুর তখনি হলো মৃত্যু! সঙ্গে সঙ্গে দুখানা ট্রেলার ভরতি অত যাত্রী দুদ্দাড় করে ট্রাম থেকে নেমে ছুটে পালালো। নরাধম কাপুরুষের দল! এ-নিয়ে তখনকার দিনের দুখানি সাপ্তাহিক হিতবাদী আর বঙ্গবাসী খুব কান্নাকাটি করে ছিল। বিচারে অগাষ্টিনের কটা টাকা জরিমানা হলো। ভারতীতে তখন সরলা দেবী লিখলেন—এই সব বর্ব্বর গোরার বিরুদ্ধে নালিশ করা কাপুরুষতা—হাতে-হাতে সাজা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি লিখলেন—দু-দুখানা ট্রাম-ভরতি লোক—তারা ঐ ফিরিঙ্গিটাকে ধরে যদি দু-ঘা করে চাঁটি মারতো তাহলে নিরীহ শরৎবাবু প্রাণে মারা যেতেন না।

সাহিত্য-পত্রিকা হলেও ভারতীতে সরলা দেবী তখন ঐ কাপুরুষতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। সুস্পষ্টভাষায় তিনি লিখলেন—বিলাতী ঘুষির বদলে দেশী ঘুষি, বিলাতী লাথির বদলে দেশী লাথি দেওয়া চাই। তাঁর এ উদাত্ত বাণী তখনকার তরুণ সমাজকে রীতিমত সচেতন করে তুলেছিল—গোরার ভয় প্রশমিত হচ্ছিল।

তারপর ১৯০২ সালের কথা—আশ্বিন মাস…কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সলভ্যান নামে এক গোরা তার দর্জ্জীর বেয়াদবিতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে গুলি করে মারে—Cold blooded murder-এ ব্যারাকপুরে গোরা সোয়ানের সবুট পদাঘাতে এক পাখাটানা কুলির হলো 'প্লীহা' ফেটে মৃত্যু। ভারতী (আশ্বিন, ১৩০৯) পত্রিকায় সরলা দেবী লিখলেন—ইতর শ্বেতাঙ্গের স্পর্দ্ধা এবং সাহস এতই বর্দ্ধিত হইতেছে যে ভদ্র-অভদ্র সম্ভ্রান্ত দেশী লোককে তাহারা কুকুরের ন্যায় দেখিতেছে!

ঐ বছরেই আশ্বিন মাসে চাঁদপুরের এক ঘটনা। এক বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্যাপটেন জাকসন নামে এক গোরা চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে নামিয়ে দেয়—ডেপুটি কোর্টে নালিশ করেন। বিচারে জাকসনের হয় পনেরো টাকা জরিমানা। এই প্রসঙ্গে ভারতী পত্রিকায় সরলা দেবী লিখলেন—কর্ণপীড়ন, অর্দ্ধচন্দ্র—এদেশের পুরুষেরা প্রাণের ভয়ে বিপদের আশঙ্কায় সমর্থন করিয়া যায় তাহার পর ছাপার অক্ষরে সেই পলায়নকে মূর্ত্তিমান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে: ধিক!

প্রতিমাসে সরলা দেবী এমনি কথা লিখতে লাগলেন: ভারতীতে লিখলেন,—বরমেকো বীর পুত্র ন চ ভীরু শতৈরপি।…লিখলেন—অক্ষমের আবার ক্ষমা কি! ক্ষমা-সাধনের জন্ত প্রথমে ক্ষমতাবান হওয়া আবশ্যক—ক্ষমতার চর্চা প্রয়োজন। সক্ষম ব্যক্তিই ক্ষমা দেখাইতে পারে। অক্ষমের ক্ষমা হাসির কথা।

তাঁর এ-সব কথা নিষ্ফল হলো না। শহর মফঃস্বল থেকে প্রতিমাসে খবর আসতে লাগলো কোথায় কোন সাহেব 'নেটিভে'র সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে কিভাবে হাতে হাতে তার শোধ পেয়েছে—এসব সংবাদ ভারতীতে নিয়মিত ছাপা হতো—পড়ে তরুণ সমাজের মন জড়তা ভেঙ্গে শঠে-শাঠ্য-নীতি প্রয়োগে তৎপর হতে লাগলো। দেশের আবহাওয়া বদলাতে লাগলো। ভারতীতে শুধু লেখা নয়—তিনি বীরাষ্টমী ব্রত পালনের ব্যবস্থা করলেন—প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসবের ব্যবস্থা করলেন; এবং বীর্য্য শৌর্য্য চর্চ্চার জন্ত ভারতীর প্রাঙ্গণে মার্ত্তজা ওস্তাদকে আনিয়ে তরুণদের অসিক্রীড়া শেখাবার এবং হরদয়ালকে দিয়ে লাঠি চালনা শেখাবার ব্যবস্থা করলেন।

একথা বলার অর্থ, এযুগের অনেকে জানেন না 'ভারতী' একদিকে দেশে যেমন সাহিত্যানুশীলনকে পরিপুষ্টির দ্বারা বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে—তেমনি বাঙালীর মনে মনুষ্যত্ব-বিকাশে এবং সম্ভ্রমবোধ ও জ্ঞানানুশীলনে রীতিমত সাহায্য করেছে।

সরলা দেবীর বিবাহ হয় বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী লাহোরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে। ১৩১১-১২ সাল পর্যন্ত কলকাতায় নিত্য আসা যাওয়া ছিল তাঁর কিন্তু তিনি লাহোর থেকে সম্পাদকীয় কর্তব্য করতেন এবং তাঁর এ-কাজে কলকাতা থেকে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দীনেশচন্দ্র সেন করতেন তাঁকে সাহায্য।

১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সরলা দেবী কলকাতায় এলেন। সে বছর নানা গোলোযোগে 'ভারতী'র বৈশাখ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়নি। তখন আমাকে ডেকে তিনি ভারতীর ভার দিয়ে বলেন, সম্পাদনার কাজে তাঁকে সহায়তা করবার জন্য ঠাকুরবাড়ী থেকে লেখা সংগ্রহ করা গেলনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি বলেন, নিয়মিত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা লেখা দেবেন না। আমার কাছে ছিল শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' উপন্যাসের কপি—সরলা দেবীর পরামর্শে তিন সংখ্যায় বড়দিদি তিনি ছাপতে বললেন— প্রথম দু সংখ্যায় লেখকের নাম ছাপা হলোনা। সরলা দেবী বললেন, লেখকের নাম ছাপা না থাকলে অনেকে মনে করবেন রবীন্দ্রনাথের লেখা। সেই ভাবেই ভারতীতে বড়দিদি ছাপা হলো, আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি' শেষ হলো—সেই সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের নাম দেওয়া হলো লেখক বলে।

কিন্তু বহু প্রয়াসেও ভারতীকে নিয়মিত করা গেল না। ১৩১৪ সালের মাঘ মাসে ভারতীর আশ্বিন সংখ্যা ছাপা হলো। তখন স্বর্ণকুমারী দেবীকে বহু সাধ্যসাধনা করায় ১৩১৫ সালের ১লা বৈশাখ থেকে তিনি নিলেন ভারতী সম্পাদনার ভার। তিনি আমাকে নিলেন সঙ্গে তাঁর কাজে সহায়তা করতে।

তাঁর হাতে 'ভারতী' আবার অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত হলো, কত নূতন নূতন লেখক তিনি সৃষ্টি করলেন। ১৩২১ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীলাল ঘোষাল পরলোক গমন করলে তিনি শোকাভিভূত হয়ে ভারতীর ভার অর্পণ করলেন বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে—তখন ১৩২২ সাল থেকে ১৩৩০ সাল পর্যন্ত মণিলাল এবং আমি একযোগে ভারতীর সম্পাদনা করি। ১৩৩০ সালে স্বামিবিয়োগের পর সরলা দেবী এলেন কলকাতায় বাস করতে, তখন তাঁর হাতে ১৩৩১ সালের বৈশাখে ভারতী সম্পাদনার ভার তুলে দিয়ে আমরা অবসর গ্রহণ করি।

ভারতীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে যে সাহিত্যনিষ্ঠা ছিল এবং কলারুচি অনুশীলনে যে আদর্শ ছিল, আমরা দুই বন্ধুতে যথাসাধ্য তা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছি এবং 'ভারতী' থেকে আমরা একটি পাইপয়সা পকেটজাত করিনি—যোগ্য লেখক-লেখিকাকে তাঁদের চাহিদা মতো সেলামী দিয়েছি। এই হলো ভারতীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

আধুনিক শিক্ষা

আধুনিক শিক্ষা কি নিয়মে চলছে জানেন?

মাস্টার মশয়রা ভয় করছেন হেডমাস্টারকে, হেডমাস্টার মশায় ভয় খাচ্ছেন সেক্রেটারীকে, সেক্রেটারী স্কুল কমিটির কথা শুনে ভিরমি খাচ্ছেন, কমিটির সদস্যরা সদা সশঙ্কিত অভিভাবকদের রুদ্রমূর্তি স্মরণ করে, অভিভাবকরা ভেবেই খুন এই বুঝি ছেলেরা এক কাণ্ড করে বসে, আর ছাত্রের দল—না, তারা কাউকে ভয় করছে না।

বিশিষ্ট মার্কিন লোকনৃত্য শিল্পী রিকিহোলডেন

যৌবনের ধর্মই এই যে সে চায় চিত্তবিনোদনের খোরাক, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ,—যে প্রমোদের উপকরণের মধ্যে থাকবে সজীবতা, প্রাণচাঞ্চল্য।

লোকনৃত্য এই চিত্তবিনোদনের উপকরণ যোগায়। এর একটা সার্বজনীন আবেদন আছে। জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির সকল বাধা অতিক্রম করে এ সরাসরি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে।

এইরকম একজন লোকনৃত্যশিল্পী সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছেন ভারতে। ২৯শে মার্চ তিনি কলকাতায় আসছেন, আর ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত এখানে থাকবেন বলে স্থির হয়েছে। এঁর নাম রিকি হোলডেন। শ্রীহোলডেন আমেরিকায় লোকনৃত্যের একজন দিকপাল।

আমেরিকার লোক নৃত্যশিল্পী রিকি হোলডেন

ইণ্টারন্যাশনাল রিক্রিয়েসন আসোসিয়েশনের বিশেষ প্রতিনিধি-রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের শিক্ষা বিনিময় পরিকল্পনা অনুসারে শ্রীহোলডেন বর্তমানে এশিয়ার সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শ্রীহোলডেন একজন পেশাদার লোকনৃত্যশিল্পী ও স্কোয়ার ড্যান্সের ক্ষেত্রে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। শিল্পের এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই মার্কিন শিল্পীটির মত বিশ্বের এত বেশি অংশ পর্যটন করেছেন এরকম আর কাউকে দেখা যায় না।

শিল্প-সংস্কৃতির লোকনৃত্য শাখাটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা এর অন্যান্য শাখায় নেই। মঞ্চে লোকনৃত্যানুষ্ঠান চলবে আর প্রেক্ষাগৃহে বসে লোক তা দেখবে ও দেখে উপভোগ করবে, এরকম শিল্প লোকনৃত্য নয়। এইখানেই লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য যে আর পাঁচটা শিল্পের মত তা ঘরে বসে উপভোগ করবার জিনিষ নয়, দলবদ্ধভাবে এই নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিলে তবেই তা থেকে আনন্দ পাওয়া যায়, তবেই

তার রস উপভোগ করা যায়। লোকনৃত্য প্রদর্শনীর জিনিষ নয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের অংশ এতে অনেক কম। এতে সক্রিয় অংশ নিয়ে তা থেকে আনন্দরস গ্রহণ করতে হয়। এর আনন্দ দর্শকের চোখের আনন্দ নয়, এর আনন্দ নৃত্যে অংশগ্রহণকারীর হৃদয়ানুভূতির আনন্দ।

মার্কিন স্কোয়ার ড্যান্স বা চতুষ্কোণ নৃত্যটি লোকনৃত্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমেরিকানদের মধ্যে চতুষ্কোণ নৃত্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। চারটি যুগল এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেকটি যুগল একটি কাল্পনিক চতুষ্কোণের এক একটি কোণে দণ্ডায়মান হয়। নৃত্য পরিচালনার জন্য একজন নেতা থাকেন। তাঁর নির্দেশমত শিল্পীরা বিভিন্ন ভঙ্গি ও বিভিন্ন ছন্দে তালে তালে নাচতে থাকেন।

শ্রীহোলডেন ৮ সপ্তাহকাল সফর করার জন্য ভারতে এসেছেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাঁর ভারত সফর শুরু হয়েছে, ২৯শে এপ্রিল শেষ হবে। লোকনৃত্যের দিক থেকে ভারত প্রভূত সম্পদশালী। শ্রীহোলডেন তাই এই সম্পদের কিছুটা নিজের ভাণ্ডারে তুলতে চান।

১৯৫৮ সালে তিনি আর একবার ভারতে এসেছিলেন। সেবার এসেছিলেন মাদ্রাজে। স্বল্পকালের দর্শনে সেবার তিনি ভাল করে ভারতকে উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই এবার তিনি ভারতকে প্রকৃত জানতে চান, তার লোকনৃত্য থেকে কিছু শিখতে চান।

শ্রীহোলডেন লোকনৃত্য সম্পর্কে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতীক

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ইতিহাসের প্রতীক

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই ১২৫ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি জন মার্শালের মৃত্যুর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ইতিহাসের বিখ্যাত প্রতীক "স্বাধীনতার ঘণ্টায়" ফাটল দেখা যায়। এই ঐতিহাসিক ঘণ্টাটির গায়ে সব দেশের জনসাধারণের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা কর" এই কথা কয়েকটি উৎকীর্ণ করা আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার সময় ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই প্রথমবার
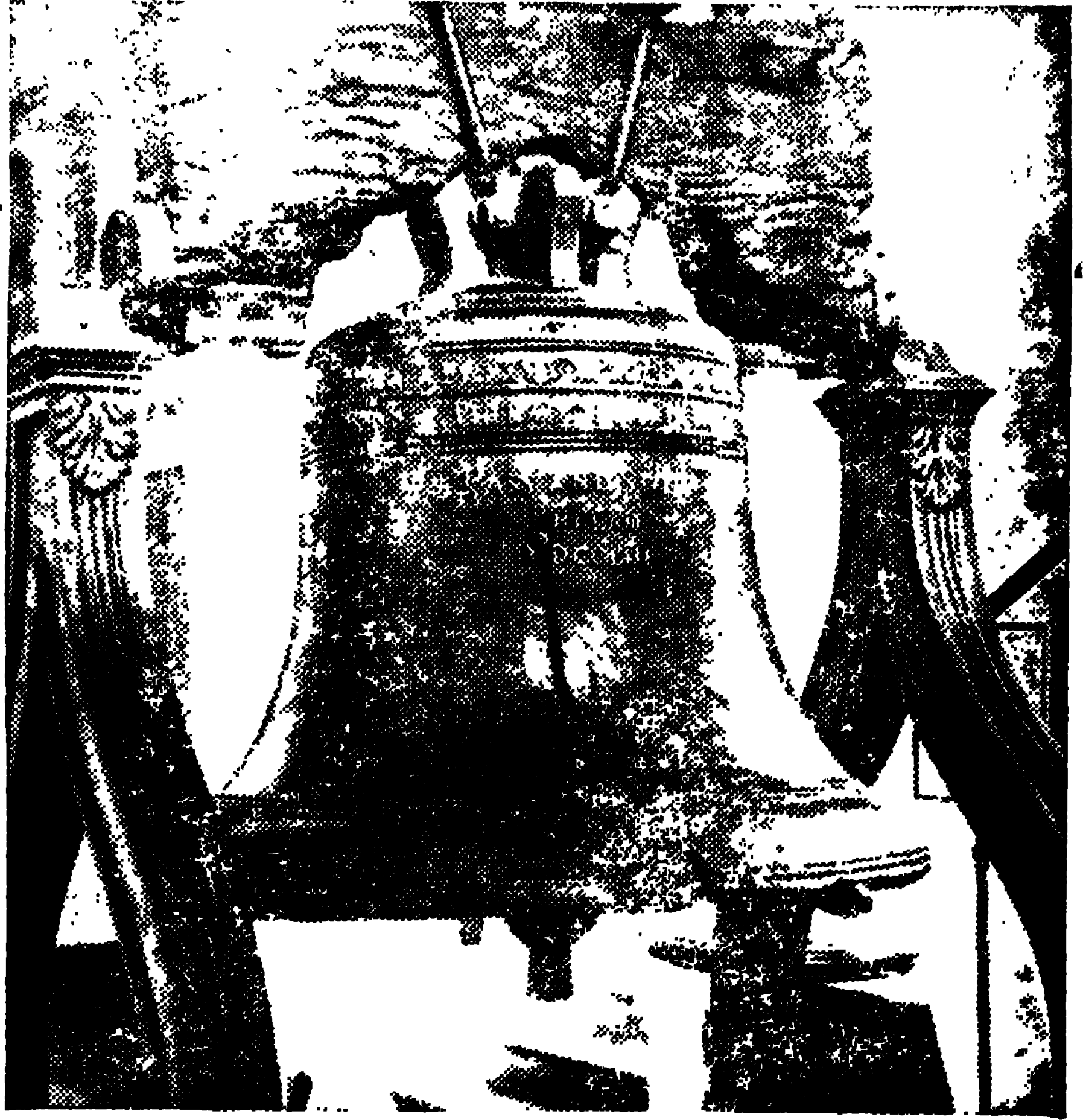
এই ঘণ্টা বাজান হয়। বৃটেন যখন ফিলাডেলফিয়া আক্রমণ করে তখন এই ঐতিহাসিক ঘণ্টাটিকে গোপনে সংরক্ষিত করা হয়। ১৭৭৮ সালে ফিলাডেলফিয়ার "স্বাধীনতা হলে" এই ঘণ্টাটিকে রাখা হয়।" ঘণ্টাটি এখনও পর্য্যন্ত সেইখানেই আছে।

নিউজপ্রিণ্ট মিলের পুকুর
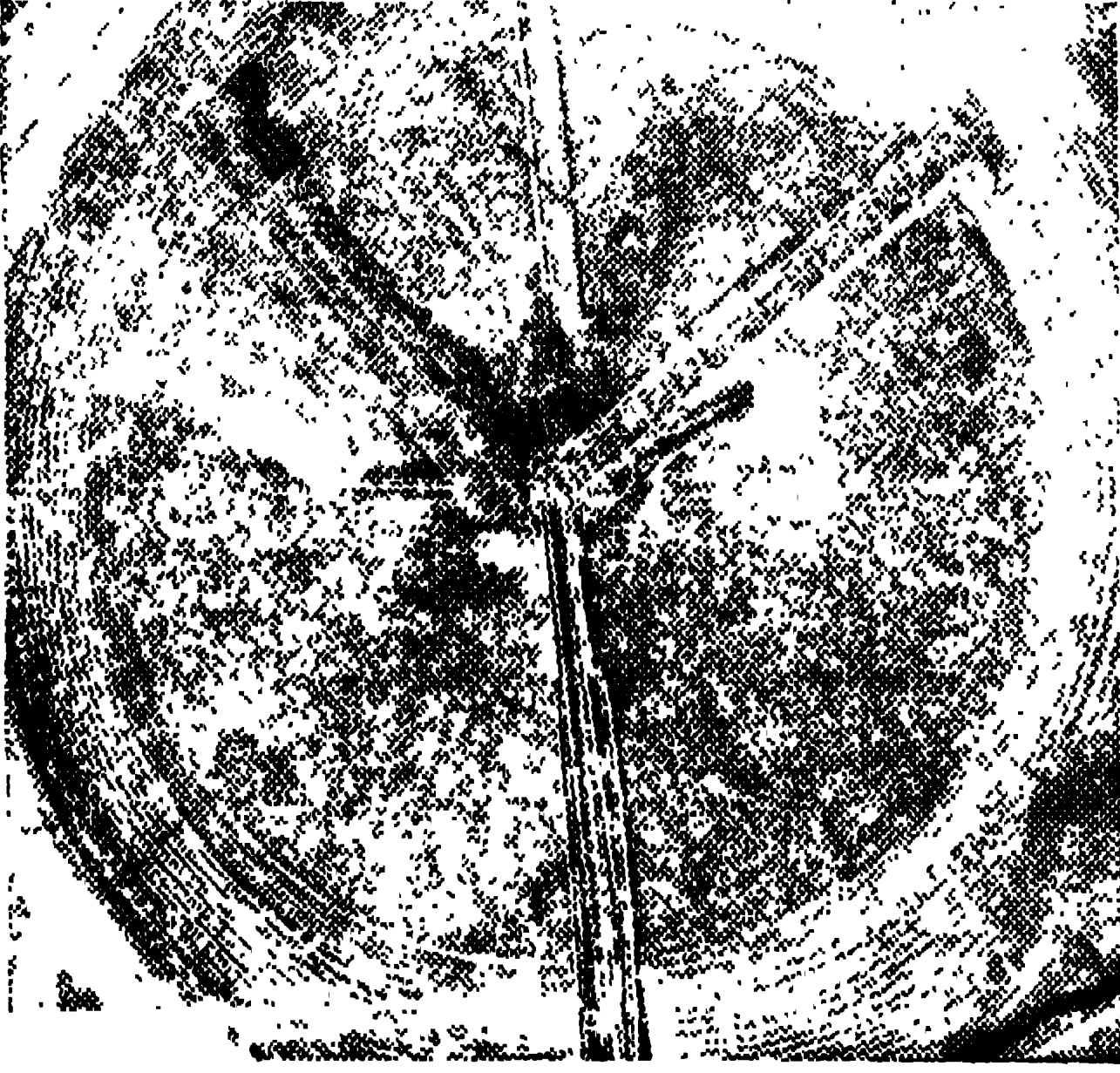
আমেরিকার টেনেসি রাজ্যের কেলহন সহরের বোওয়াটার্স সাদারেন পেপার কর্পোরেশনের কংক্রীটের জলাধারে ২০ লক্ষের উপর কাঠ ভাসতে পারে। এই জলাধারে যে পরিমাণ জল আছে তাতে দশ হাজার টনের জাহাজ অনায়াসে ভাসতে পারে। আগুণ, পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকেএই জলাধার কাঠকে রক্ষা করে। যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিউজপ্রিণ্ট ব্যবহার করে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বৎসরে ৮০ লক্ষ টন নিউজপ্রিণ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এগার হাজারেরও অধিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ৭৩টি বৈদেশিক ভাষার সংবাদপত্রসহ দৈনিক সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ৩৮০ লক্ষের উপর।

সোভিয়েত রাশিয়ায় বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন—

রুশ পণ্ডিত ও গবেষকরা বহুকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন করে আসছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রখ্যাতনামা রুশ পর্য্যটক হেরাসিম লেবেদফ ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ শালায় যে সমস্ত বাংলা বই ছিল তার মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলীও ছিল। এই বইগুলি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগে এখন সযত্নে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাঁর রচনাবলী রাশিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। শুধু রুশ ভাষাতেই নয়। অন্যান্য রুশীয় ভাষায়ও রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ তখন অনুদিত হয়েছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের পর রুশ দেশে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন সুরু হয়। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সোভিয়েট পণ্ডিতদের অন্যতম লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম, আই, তুবিয়ানস্কি রবীন্দ্র সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনায় নিযুক্ত হন। অধ্যাপক তুবিয়ানস্কি রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতীয় ছন্দশাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তি ছিল বলে রুশ সাহিত্যসেবীদের মধ্যে তিনিই প্রথম রবীন্দ্র-কাব্য অনুবাদের একটা নীতিগত পদ্ধতির প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে মূল ছন্দ ও কাঠামো বজায় রাখা সম্ভব ও বাঞ্ছনীয়। তুবিয়ানস্কি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্"

সঙ্গীতটিরও অনুবাদ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য রচনাবলী ও উপন্যাসখানির পটভূমিকা নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার বাংলাসাহিত্যের অনুশীলন প্রধানতঃ রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৪০ সালে বাঙালী শিক্ষক দাউদ আলী দত্ত ও সহকারী অধ্যাপক এ, এম, জিমিনের পরিচালনায় লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র, ছাত্রীরা তাঁদের স্নাতক-লাভের বিষয় হিসাবে মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলী নির্ব্বাচন করেন। সাম্প্রতিক কালে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পড়ান হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক লেখকদের লেখাও সম্প্রতি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রীরা বাংলা কাব্যের একখানি সংকলন প্রকাশ করেন। এই সংকলনে উনিশ ও বিশ শতকের কবিদের রচনা সংকলিত হয়েছিল।

সোভিয়েট পণ্ডিতদের বিশেষ মনযোগ নিবদ্ধ রবীন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৫৫-১৯৫৭ সালে মস্কোর কথা সাহিত্য ও কবিতা প্রকাশনা ভবন থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনার আট খণ্ডের এক রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে "নৌকাডুবি", "ঘরে বাইরে", "গোরা", "চোখের বালি", "শেষের কবিতা", "ডাকঘর" ইত্যাদি। আটখণ্ডের সংস্করণটি সোভিয়েট রাশিয়ায় রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুশীলনে মস্ত বড় সহায়ক। বর্তমানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ১৬টি ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্য অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

সোভিয়েট ভারত বিদ্যাবিদরা কবিগুরুর আসন্ন জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য আয়োজন করছেন। এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে কথাসাহিত্য ও কবিতা ভবন থেকে কবির রচনাবলীর ১২ খণ্ডের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে সোভিয়েট দেশে বাংলা সাহিত্যের চর্চা আরও বেশী হবে এবং বাংলাভাষার সমাদর আরও বাড়বে এটাই আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা।

'হাউ ডিয়ার টু মাই হার্ট' গ্রন্থের রচয়িতা এমিলি কিমব্রো সবে মাত্র বক্তৃতা শেষ করেছেন লেখকদের সম্মুখে এমন সময় বেয়ারা এসে একটা চিরকুট দিয়ে গেল।

চিঠি পাঠিয়েছে তাঁর ন' বছরের মেয়ে।

—আঃ শেষ পর্যন্ত আমার ঘরের লোকের কাছ থেকে অভিনন্দন আসছে আমার বইএর জন্যে—বললেন লেখিকা আর পত্রখানি খুলে ধরলেন।

তাতে লেখা আছে : বেশ লিখেছ মা আমি কি দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবো ?

দাঁতভাঙা শব্দ !

হকি লীগ

কোলকাতার খেলার আসর বেশ জমে উঠেছে। মরশুমটা এখন হকির। রোম অলিম্পিকে পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হবার পর এই প্রথম আনুষ্ঠানিক হকি খেলা চলছে। প্রথম বিভাগীয় হকি লীগের খেলা এখন শেষ হবার মুখে। হকি মরশুম শুরু হবার পর মাঝপথে একটু ভাঁটা পড়েছিল। এর কারণ হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের অংশগ্রহণ। হকি লীগে গতবারের চ্যাম্পিয়ান জনপ্রিয় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব, বিখ্যাত কাষ্টমস দল ও অপর জনপ্রিয় দল মোহনবাগান তাদের পুর্ব সুনাম অনুযায়ী এবার খেলা শুরু করতে না পারলেও, এখন কিন্তু তাদের মধ্যেই চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাচ্ছে। দল তিনটিই প্রায় সমান সমান। এর মধ্যে অবশ্য মোহনবাগান দল তাদের অপরাজিত আখ্যা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়নি। পয়েণ্ট নষ্ট এখন পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল ও কাষ্টমস দল একটি করে করেছে এবং মোহনবাগান দলের একমাত্র পরাজয়ে পয়েণ্ট নষ্ট হয়েছে দুটি। লীগের বড় ম্যাচগুলি এপর্য্যন্ত খেলা হয়নি। এই খেলাগুলির ফলাফলেই চ্যাম্পিয়ানশীপের মীমাংসা হবে।

এবার লীগে বাঙ্গালী খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত প্রথম হকি লীগ বিজয়ী ভারতীয় দল গ্রীয়ার স্পোর্টিং তাদের সুন্দর ক্রীড়ানৈপুণ্যে সকলকে মুগ্ধ করেছে। লীগে প্রথম মহঃ স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে গ্রীয়ার দল বিস্ময়ের সৃষ্টি করে! অবশ্য যারা সেদিন খেলা দেখেছিলেন তারা মোটেই বিস্মিত হননি। সেদিনের খেলার পর থেকেই সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন যে জনপ্রিয় দল দুটিকে এই দলের কাছে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। কার্য্যক্ষেত্রে হোলও তাই। জনপ্রিয় মোহনবাগান দল তাদের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের নিয়েও অখ্যাত খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত গ্রীয়ার দলের কাছে প্রথম পরাজয়কে এড়াতে পারলো না। আর অপর জনপ্রিয় দল লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল প্রথমে গোল খেয়ে যাবার পর কোনক্রমে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করতে সমর্থ হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইষ্টবেঙ্গল—গ্রীয়ার দলের খেলায় উত্তেজনা এমনই চরমে ওঠে যে উভয় দলের খেলোয়াড় ও কর্ম্মকর্তারা তাদের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিকে দমন করতে পারেন না। যার ফলে মরশুমে প্রথম খেলার মাঠে একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই খেলায় মোহনবাগান দলের গ্রাউণ্ড সেক্রেটারী দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকেও আহত হতে হয়। মোহনবাগান দল এইরূপ ঘটনার প্রতিবাদ করে চ্যারিটি ম্যাচে ইষ্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে না খেলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মোহনবাগান দলের এই প্রতিবাদ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না, তবে এইটুকুই শুধু বলবো খেলোয়াড়দের চেয়ে খেলাই হোল বড়।

জাতীয় হকি

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারতীয় রেল ও পাঞ্জাব দল। প্রথম দিন খেলা অমীমাংসিত থাকার পর দ্বিতীয় দিন ভারতীয় রেলওয়ে দল পাঞ্জাব দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। এ বছরের প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নতি

দেখা গেল না। হকিতে ভারতের হারানো গৌরবকে উদ্ধার করতে হলে এখন থেকেই প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। এর জন্যে অবশ্য প্রয়োজন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও চেষ্টা। আশা করি ভারতীয় হকি ফেডারেশন এই বিষয়ে উঠে পড়ে লাগবে।

ফুটবল

কোলকাতায় ফুটবল মরশুম শুরু হবে মে মাসে, কিন্তু এখন থেকেই সর্বত্র এই নিয়ে নানান্ রকম জল্পনা-কল্পনা চলেছে। গত ১৫ই মার্চ ছিল ফুটবল খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের শেষ দিন। এ বছর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বেশী হয়নি। এর একটি কারণ বলা যায় জনপ্রিয় মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের দল ফেব্রুয়ারী মাসে তাদের দেড়মাসব্যাপী পূর্ব আফ্রিকা সফর শুরু করায় তাদের খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের সুযোগ হয়নি। এরই মধ্যে অবশ্য মোহনবাগানের দুজন তরুণ খেলোয়াড় সুনীল নন্দী ও সুকুমার সমাজপতি চলে এসেছেন জনপ্রিয় ইষ্টবেঙ্গল দলে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই দুজন খেলোয়াড় পূর্ব আফ্রিকা সফরে যাননি। ইষ্টবেঙ্গল দল থেকেও এবার অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড় চলে গেছেন। বিখ্যাত ফুটবল যাদুকর আমেদ খাঁ, বীরবাহাদুর ও কানাইয়ান যোগদান করেছেন মঃ স্পোর্টিং-এ। রবীনগুহ ১৫ই মার্চ দল পরিবর্তনের শেষদিনে যখন আই. এফ. এ. অফিসে আসেন ছাড়পত্র স্বাক্ষর করবার জন্য, তখন অফিসের বাইরে অপেক্ষমান ক্রীড়ামোদীদের এক অংশ ইট পাথর সোডার বোতল প্রভৃতি ছুঁড়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে—যাকে খণ্ড যুদ্ধ বলা যায়। যার ফলে রবীন গুহ স্বাক্ষর না করেই চলে যান, পরে এক সময়ে লুকিয়ে তাঁকে আসতে হয়। প্রিয় দল থেকে খেলোয়াড় চলে গেলে মনে ব্যথা লাগা স্বাভাবিক। তবে জগতের রীতি হোল 'এক আসে আর যায়'। সেইজন্যে উপযুক্ত কাজ হোল খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের পরিচয় দেওয়া অর্থাৎ সব সহ্য করা। এই ধরণের ঘটনা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়, কারণ এতে নিজেদের তো বটেই, এমনকি ক্লাবের সুনামেও আঁচড় পড়ে। খেলার আসরের পবিত্রতা রক্ষা করার ভার ক্রীড়ামোদী, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা সকলেরই। একথা ভুলে গেলে আমাদের জাতীয় চরিত্রেরই হবে অবনতি। আশা করব ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনা আর ঘটবে না। খেলার মাঠের সুনাম ও ঐতিহ্য রক্ষা করার দায়িত্ব আামাদের সকলের।

বৈজ্ঞানিক এডিসন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইন্‌ক্যানডেসেণ্ট ল্যাম্পের জন্যে একটা ফিলামেণ্ট উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন।

এক হাজার ন'শো নিরানব্বইটি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন চলেছে দ্বিসহস্রতম পরীক্ষা। ফলাফল জানার জন্যে সবাই উৎসুক।

এ পরীক্ষাটিও ব্যর্থ হোল।

অসীম ধৈর্যে এডিসন মন্তব্য করলেন, এর মানে হোল পৃথিবীতে এমন দু হাজারটা জিনিষ রয়েছে যাদের নিয়ে আমাদের আর চেষ্টা করতে হবে না।

কত সুবিধে বুঝুন। আমরা যেখানে কেবল ব্যর্থতা দেখছি তিনি সেখানে দেখছেন তার উল্টো পিঠ। আমাদের জীবনেও এমনি দেখা শিখতে হবে: সকল ক্ষতির উল্টো পিঠে লাভ বলে একটি বিষয়।

চমক

মানুষ কি-না পারে!

তখন চলেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটা—

১৯৩০ সালে প্রয়োজন হো'ল আফ্রিকার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার নিয়ে যাবার, যাতে বিশেষ জরুরী খবরাখবর চলাচল করতে পারে।

ব্যাপার ত সহজ নয়। এ সেই আফ্রিকা, যার ভয়াবহ বিস্তৃত বনভূমি মরণের সিংহদ্বার। পাহাড়, নদী, হ্রদ, অরণ্য,—কোন্ আদিমযুগের ভীষণতা আর রহস্য বুকে নিয়ে আজও অনাবিষ্কৃত হয়ে পড়ে আছে। সেখানে দুর্দ্দান্ত সিংহ, উন্মত্ত বন্য হস্তী, বিষধর সর্প, ভীষণতম গরিলা দুর্ব্বার গণ্ডার,—সেই দুর্ভেদ্য

বনভূমিকে তাদের নির্ম্মম হিংস্রতার লীলাক্ষেত্র করে তুলেছে। আর আছে নদীহ্রদে রক্তলোলুপ কুম্ভীরের দল, যারা জলরাজ্যে করেছে একছত্র আধিপত্য স্থাপন। সেখানে অন্ধকার অরণ্যে বাস করে নরখাদক বর্ব্বর আদিম মানুষ। মানুষের কাঁচা রক্তমাংসই যাদের প্রধান খাদ্য।

সামনে পড়বে দুস্তর মরুভূমি, নিবিড় অরণ্য, বেগবতী নদী,—পার হয়ে যেতে হবে মানুষকে টেলিগ্রাফের তার খাটিয়ে তারই ওপর দিয়ে জীবনকে তুচ্ছ করে। কারা এ কাজের ভার নেবে? কারা তুলে ধরবে মানব-সভ্যতার জয়কেতন? কারা যাত্রা করবে দুর্গম মৃত্যুভয়াল অজানা অন্ধকারপথে।

এ কাজে সহায়তা করতে এগিয়ে এল ইউনিয়ন অব্ সাউথ্ আফ্রিকা, সাদার্ণ ও নদার্ণ রোডেসিয়া, আর অন্যান্য সভ্যদেশ যারা আফ্রিকাকে নূতনযুগের আলোকে আনতে চায়।

কাজ সুরু হোল, কত যে তরুণপ্রাণ নিঃশেষে আপনাকে বলি দিল এই সঙ্কট মুহূর্ত্তের তাগিদে তার ইয়ত্তা নেই। কতবার বর্ব্বর মানুষ ও বন্যজন্তুদের দৌরাত্ম্যে তার ছিন্ন হোল, থাম উৎপাটিত হোল, যন্ত্রপাতি চূর্ণ হোল কিন্তু কর্ম্মীদের উৎসাহ বেড়েই গেল। বিপদকে তুচ্ছ করে, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে, নিদারুণ কষ্টকে উপেক্ষা করে তারা নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলল। বুকে তাদের দ্বিগুণ উৎসাহ, তিলমাত্রও পিছিয়ে এল না তারা। জীবনমৃত্যুর ভয়াবহ সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দিগ্‌ভ্রান্ত, আতঙ্কে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েও দ্বিগুণ উৎসাহে মরণপণ করে তারা এগিয়ে চলল। শীতের দারুণ প্রকোপ, গ্রীষ্মের দুঃসহ প্রচণ্ডতা, বর্ষার প্রবল আবির্ভাবেও তারা ভুলে গেল না তাদের কাজ। দিনের পর দিন মরণের সঙ্গে চল্‌ল তাদের পাল্লা,—শেষে একদিন জয়যুক্ত হোল তাদের সাধনা,—আফ্রিকার অন্তঃস্থলে বিধ্বনিত হোল তাদের মিলিত কণ্ঠে সাফল্যের আনন্দোচ্ছ্বাস।

যারা এই কাজে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের নাম হয়ত কেউ জানে না, কোন ইতিহাসের পাতায় তাদের সন্ধান মেলেনা,—কিন্তু আজ প্রতিমুহূর্ত্তে টেলিগ্রাফের তারে তাদের জয়ধ্বনি শোনা যায়। মৃত্যু কালজয়ীদের দল আজও উদাত্ত কণ্ঠে জগৎকে জানাচ্ছে—মানুষ কি না পারে!

শিল্পীদের উপর ভার পড়ল এমন এক নারীমূর্ত্তি পাথরে গড়তে হবে যার তুলনা জগতে কোথাও পাওয়া যাবে না।

তখনকার দিনের বিখ্যাত ভাস্করেরা উঠে-পড়ে লেগে গেলেন মূর্ত্তি গড়তে।

বিখ্যাত শিল্পী ফিডিয়াস্ তখন অসুস্থ। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন মনে মনে। হয়ত তিনিই একমাত্র পারেন গড়ে তুলতে এই নারীমূর্ত্তি।

তরুণ শিষ্য গুরুর মনের ব্যথা বুঝলেন। কিন্তু উপায় কি?

চারদিকে শিল্পীদের মধ্যে মহা উত্তেজনা। একবছর পরে প্রায় সকলেরই নারীমূর্ত্তি অপরূপ হয়েছে বলে সমালোচকেরা মত প্রকাশ করলেন। পুরস্কার দিতে হলে প্রায় প্রত্যেকেই দিতে হয়।

অসুস্থ ফিডিয়াস এ সব কথা শোনেন আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। হায়, যদি তাঁর বাটালি ধরবার শক্তি থাকৃত!

হঠাৎ একদিন সমালোচকের দল তাঁর দরজায় এসে হাজির।

ব্যাপার কি?—ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ফিডিয়াস্।

—আপনি এতদিন প্রকাশ করেন নি কেন? আপনার মূর্ত্তিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে কোথাও যে এর তুলনা নেই।

আমার গড়া মূর্ত্তি?—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন ফিডি াস।

হাঁ, মহাশয়, আপনারই,—আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী।

ফিডিয়াস্ সন্ধান নিয়ে জানলেন, তাঁর সেই তরুণ শিষ্যটিই এ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছে, আর গুরুর নামেই চালাতে চেয়েছে। লজ্জিত শিষ্যটিকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, কিন্তু ভেনাস্-ডি-মিলোর আজও তুলনা নেই।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ধারা অনুযায়ী গল্প-ভারতী পত্রিকার মালিকানা অন্যান্য বিষয়ক বিবরণ।

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

১।	প্রকাশের স্থান—	২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা—৬
২	প্রকাশের সময়—	মাসিক
৩	মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৩৩/এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬
	প্রকাশকের নাম—	শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৩৩/এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬
	সম্পাদকের নাম—	শ্রীকালিদাস নাগ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	১০৮, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা—২৬

৬। যে সকল অংশীদার মোট মূলধনের এক-শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—

৭। শ্রীনীলিমা রাণী রায়—৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

শ্রী ডি, দেবী—৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬

শ্রী এস, এল, রায়—৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আমি শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১।৩।৬১ স্বাক্ষর—

প্রকাশক

বিশ্ব
রঙ্গ
চিত্র
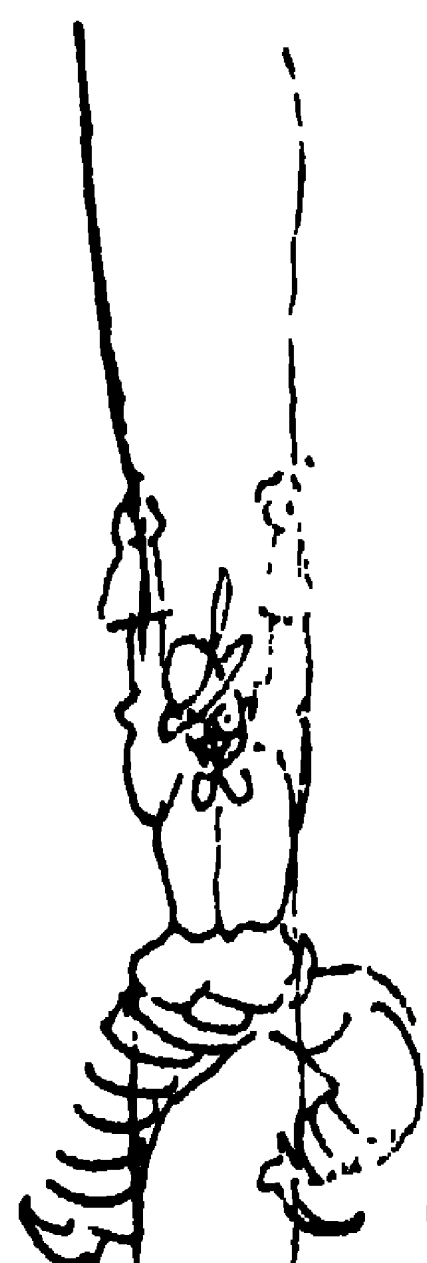
বাড়ী ভাড়া নিতে এসেছেন? আসুন!
……আমি কিন্তু এখনও ছাড়িনি।
আর একটা কথা……
এবাড়ীতে বড্ড ভূতের ভয়!
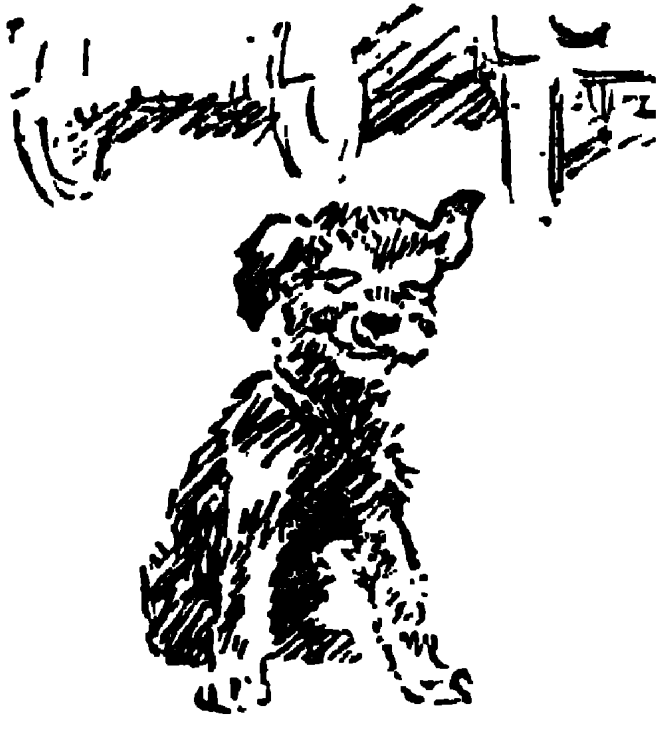
নিজের মর্জিতে যখন চলি···
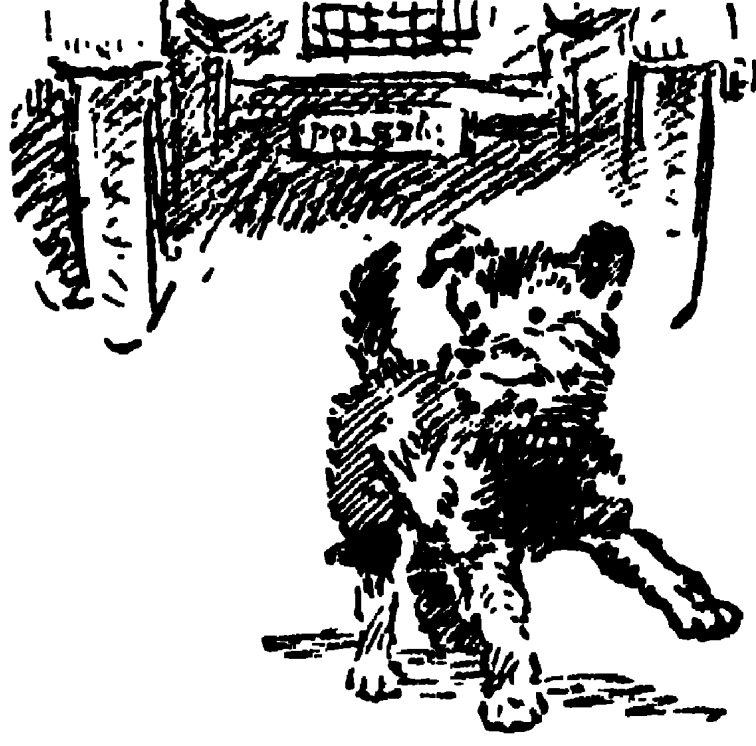
একলা রাস্তা পার হতেও খুব পারি···

সামনে গাড়ী এলেও ভয় করি না

কিন্তু যখন·

তখন অবস্থা হয় সঙ্গীন·

চরমেও ওঠে·

এবারে পৈত্রিক প্রাণটা·

বুঝি যায়।

তবুও আমি রাস্তা পার হচ্ছি বলে
সম্ভ্রমে ট্রাফিক থামে।

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি—হাসি খুসীর মেলা
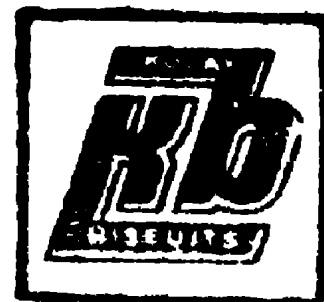
সুপ্রসিদ্ধ কোলে বিস্কুট এর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১০

শক্তি ও আনন্দ বর্ধনে
লর্ড এর
Lord's
জেলি ভরা
লজেন্স ও টফি
জেমস্ লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ
কলিকাতা-১
JL-4-58

॥ বাংলার চিত্রশিল্প ॥

Some Press Opinions

The Bengalee

September 14, 1904.

"A Bengali Artist.—Babu Bama Pada Banerjea, some of whose portraits and paintings have been most deservedly praised by Indians and Anglo-Indians alike has just put on the market a pair of excellent oleographs, the subjects being taken from Hindu Mythology, at a price which competes favourably with similar foreign productions. One is Radha's ordeal and the other Durbasa's wrath against Sakuntala. They are second twins produced by Bama Pada Babu, in the shape of oleographs, the first pair being "Uttara and Abhimanyu" and "Arjun and Urbashi" which, year before last, were so highly appreciated by the entire Hindu public. The artist has left nothing to desire for in the picture before us, which would well adorn the walls of any drawing room in Hindu India. We can scarcely think of better presents to friends and relatives at the approaching Pujahs than this pair of truly excellent paintings."

The Bande Mataram

17th March. 1908.

We are glad to note that the pictures of Santanu and Gunga and Kaikeyee and Manthara, done from the original paintings of Sjt. Bamapada Benerji, the well-known Calcutta artist, are really fine productions of art. They reflect genuine credit to Srijut Banerje's skill. The painter certainly deserves public encouragement and patronage.

AMRITA BAZAR PATRIKA LTD.
Telephone No. 2678 2, Ananda Chatterjee Lane,
Calcutta the 11th January, 1918

Dear Raja Bahadur,

Babu Bamapada Banerje is a famous painter of Calcutta. A printed copy of his testimonials, sent herewith, will show how highly have Maharajas Rajas, high officials and our leading men spoken about his great artistic talents. He needs support. Indeed every Indian who can afford should avail himself of his divine gift. I shall feel very much obliged if you can see your way to utilize his services.

Yours faithfully,
Moti Lal Ghose.

চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র জগতের প্রথিতযশা শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিবার ও তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, ও নিরহঙ্কার স্বভাব সত্যই অনুকরণীয়। বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত কৃতী চিত্রশিল্পী অথবা কবি হওয়া যায় না। আবার এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট অনুশীলন প্রতিভার বিকাশ ও বহুল প্রচার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করে—আর্থিক সঙ্গতি, সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু বামাপদ বাবুর ক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের সন্তান তিনি, না ছিল তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা, না পাইয়াছিলেন সরকারী সাহায্য। এরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র ঐকান্তিক অধ্যবসায়, অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও মনের একাগ্রতার দ্বারা তিনি চিত্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

অভিজাত সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লোকের সহিত অবাধে মেলামেশা করিবার ও স্বভাবজাত সারল্যের দ্বারা তাঁহাদের মন জয় করিবার ক্ষমতা শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লাভ করিয়াছিলেন। মজলিসী ব্যক্তি হিসাবেও খ্যাতি ছিল তাঁহার যথেষ্ট। এমন কি, অমৃতলাল বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, জলধর সেন প্রমুখ স্বনামধন্য মনীষীগণ প্রায়ই তাঁহার বৈঠকখানায় মিলিত হইতেন।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাঁহার রুচি ছিল স্বতন্ত্র। ৪৯ ইঞ্চি বহরের ধুতি, লংক্লথের সার্ট ও সাদা মার্কিন জীনের লম্বা গলাবন্ধ কোট, এই ছিল তাঁহার সাধারণ পরিচ্ছদ; আর রাজদরবার অথবা বিশেষ কোন সভাসমিতি অথবা লাটসাহেব প্রমুখ ইংরাজদিগের দরবারে যাইতে হইলে শালের পাগড়ী ও চোগা চাপকান ব্যবহার করিতেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, ছাতা তিনি সকল সময়েই ব্যবহার করিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'দেখ, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পারসী সমস্ত জাতিরই মাথা বাঁচাবার একটা শিরস্ত্রান আছে; বাঙ্গালীর কিন্তু কিছুই নেই, তাই এই ছাতা দিয়ে মাথাটা রাখি আর কি।'

স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে বামাপদ বাবুর যাতায়াত ছিল।

বামাপদবাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার জননীর তৈলচিত্র অঙ্কন করেন। পারিশ্রমিকের কথা উঠিলে শিল্পী বিনীতভাবে বলেন, 'দেখুন, আপনার কাছ থেকে এর জন্য কোন পারিশ্রমিক নিতে আমার বিবেকে বাধে।' ইহার কিছুদিন পরে কাশ্মীরের সুপরিচিত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একজোড়া সুন্দর আলোয়ান পাঠান। আলোয়ান জোড়াটি তিনি বামাপদ বাবুর গায়ে পরাইয়া দিয়া হঠাৎ বলেন 'দেখ ত, তোমাকে টোগা (Toga) পরিহিত রোমানের মত কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, চমৎকার মানিয়েছে। এ জিনিষ তোমাকেই সাজে। আমার মত বেঁটে মানুষকে কি এ সব মানায়? এটা তোমার গায়েই থাক, কেমন?' এই শ্রদ্ধার দান প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা শিল্পীর ছিল না। তিনি ভাবেন ইহাই প্রকারান্তরে তাঁহার চিত্রাঙ্কনের পারিশ্রমিক।

তখনকার দিনে চিত্রশিল্পের প্রথম বিকাশ দেখা যায় কালীঘাটের পট, কৃষ্ণলীলার পট, জগন্নাথদেব, রামরাজা, গৌর, নিতাই প্রভৃতি পটের মধ্যে। এইসব পৌরাণিক ছবির কাটতিও যথেষ্ট, দামেও সস্তা কিন্তু স্বদেশে ইহার মর্যাদা তেমন ছিল না। যাঁহারা বেশ অবস্থাপন্ন ও সৌখান তাঁহারা শরণাপন্ন হইতেন বিদেশীর। আবার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিদেশী ছবি তাঁহাদের গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত, আর্টের দিক দিয়া তাহাদের কতকটা মর্যাদা থাকিলেও রুচির দিক দিয়া একেবারে বিকৃত। বামাপদবাবু দেশের সে অভাব দূর করেন। তিনি যখন বিলাত হইতে প্রথম পৌরাণিক ছবি ছাপাইয়া আনেন, তখন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে পূর্ববর্ণিত ঐসকল পট শ্রেণীর ছবি ছাপাইয়া আনিবার পরামর্শ দেন। এই ছবির প্রচলন এখন খুব, আদর ও বেশ এবং অর্থাগমও প্রচুর। শিল্পী কিন্তু জবাব দেন 'আর্টের আদর্শকে ক্ষুন্ন করে, কেবলমাত্র অর্থাগমের ভিত্তির উপর যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত তার নাম 'Prostitution of Art." একজন বিদেশী অমর কবি বলে গেছেন "Blessed be the art that can immortalise" শিল্পের আদর্শ অতি মহান, এর বিকৃতি ঘটিলে সমাজ ও জাতির উৎকর্ষ ক্ষুন্ন হয়।

নিজের ব্যবসায়ের দিক দিয়াও বামাচরণবাবুর উদারতা ও বদান্যতা ছিল যথেষ্ট। হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার বেলচেম্বার সাহেবের প্রতিকৃতি অঙ্কনের পর সাহেবের অফিসের এক কেরাণী একদিন একখানি ফটো লইয়া তাঁহার কাছে আসেন। দু'একটি কথাবার্তার পর তিনি এক করুণ আবেদন জানান—'আমি আপনার নাম শুনে ও সাহেবের ছবি দেখে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। দেখুন মাস তিনেক হল আমার সাধ্বী স্ত্রী দু'টী অপগণ্ড সন্তান রেখে স্বর্গারোহণ করেছেন। আমার বিশেষ ইচ্ছা, তাঁর একটা স্মৃতি সম্বল করে শেষ জীবনটা কাটাই। আপনি যদি দয়া ক'রে এই ফটোখানি থেকে একটি তৈলচিত্র প্রস্তুত করে দেন, তাহলে চিরবাধিত ও অনুগৃহীত হয়ে থাকি। ছেলেরাও বড় হয়ে তাদের সজীব মাতৃমূর্তি দেখতে পায়। গরীব গেরস্থ আমি, মাসে মাত্র একশটি টাকা বেতন পাই। আপনার মর্যাদা দেবার মত অর্থ আমার নেই। মাফ করবেন, বলতে লজ্জিত হচ্ছি মাত্র একটি মাসের বেতন আমি আপনার চরণে প্রণামী হিসাবে দিতে পারি। এতে আমার সংসারের যত কষ্টই হোক।'—শিল্পী সেই কেরাণী ভদ্রলোকের আদর্শ পত্নীপ্রেম ও আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। ভদ্রলোকের চক্ষে তখন জল। শিল্পীর মনও বিগলিত হয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ছবি আমি আপনাকে বিনা পারিশ্রমিকেই করে দেব, আর সেটি উপহার দেব আপনার মাতৃহারা স্নেহের দুলালদের। ভদ্রলোকের তখনকার অবস্থা বর্ণনাতীত।

কামরূপ কামাখ্যা হতে একদিন সৌম্যমূর্ত্তি এক তান্ত্রিক সাধু নগ্নপদে শিল্পীর নিকট আসিয়া হাজির। সামান্য পরিচয়ের পর সাধু বলেন, 'আমি বহু চিত্রশিল্পীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষে আপনার আশ্রয়ে এসেছি। আপনি আমার ইহকাল পরকাল রক্ষা করুন।' শিল্পী প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারেন না, জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। সাধু পুনরায় বলেন, 'স্বপ্নে আমি আমার ইষ্টদেবীর এক অদ্ভুত মূর্তি দর্শন করেছি। কিন্তু কি দুর্দৈব যখনই জপে বসি কিছুতেই সে মূর্তি ধ্যানে আনতে পারিনা। কি হবে মালিক, আমার ধর্ম-কর্ম সব যে যায়!' 'বেশ আমি কি করতে পারি

বলুন!' বামাপদ বাবু উত্তর করেন। সাধু বলেন, 'আপনি যদি দয়া করে আমার বর্ণনা মত আমার ইষ্টদেবীর একটি ছবি প্রস্তুত করে দেন তাহলে আমার ইষ্ট লাভ হয়, আমার ইহকাল পরকাল রক্ষা হয়। আমি সন্ন্যাসী নিঃসহায়, কপর্দকহীন কাজেই মূল্য দেবার কোন ক্ষমতা আমার নেই। বিনিময়ে শুধু আমি কামনা করব আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আর কায়-মন-বাক্যে আমার ইষ্টদেবীর কাছে জানাব আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ও অপার যশ ঐশ্বর্য।' সাধুর অবস্থা দেখিয়া বামাপদবাবু রাজি না হইয়া পারেন না। কয়েকদিন পরে চিত্রখানি লইতে আসিয়া সাধু আনন্দে আত্মহারা হইয়া চিৎকার করিয়া উঠেন, 'মরি-মরি, এইতো আমার সেই!' শিল্পীও যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কবি নিজের কল্পনার দ্বারা কাগজে কলমে নিজের ভাবধারা বর্ণনা করেন। চিত্রশিল্পী তুলির আঁচড়ে সেই সমস্ত প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন। কিন্তু অন্যের স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত কল্পিত ইষ্টমূর্তির জীবন্ত আলেখ্য, একমাত্র ভগবৎ প্রেরণা ছাড়া কোন শিল্পীর পক্ষে রচনা করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

বঙ্কিমবাবুর তৈলচিত্র সর্বপ্রথম বামাপদবাবু অঙ্কিত করেন। এখন যে সমস্ত আলোকচিত্র দেখা যায় তাহার প্রায় অধিকাংশই এই শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র হইতে গৃহীত। বঙ্কিম বাবুর বাসভবনে যখন তাঁহার প্রথম চিত্রখানি সমাপ্তির পথে, তখন একদিন তাঁহার বৈবাহিক দামোদর মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাড়ীতে আসেন। সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিবার সময় ছবিখানির কিয়দংশ তাঁহার নজরে পড়ায় তিনি বলিয়া উঠেন 'এমন অসময়ে ধড়া-চুড়া পরে আবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে!' পরে অবশ্য ঘরে ঢুকিয়া তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন।

শিল্পীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্বন্ধে একটি ঘটনা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বর্দ্ধমান ডিভিশনের কমিশনার গ্রিফিথ সাহেব ছিলেন একজন দক্ষ শিকারী। একবার এক গভীর জঙ্গলে শিকারে গিয়া তাঁহার একটি চক্ষু হারান। রাণীগঞ্জ সিয়ারসোলের কুমার প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুরের রাজভবনে এক ভোজ সভায় সাহেবের সহিত শিল্পীর পরিচয় ঘটে। চিত্রশিল্পে সাহেবের ছিল প্রবল অনুরাগ। ঐসম্বন্ধে বিশেষ আলাপ আলোচনার পর সাহেব তাঁহাকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে বামাপদবাবু তাঁহার চিত্র অঙ্কনের অভিপ্রায় জানাইলে সাহেব বলেন 'মিঃ ব্যানার্জি এবিষয়ে আমার যথেষ্ট আগ্রহ, কিন্তু ভগবান আমায় একচক্ষুহীন করে আমার সব আশা নির্মূল করেছেন!' কিছুক্ষণ চিন্তার পর বামাপদবাবু জবাব দেন 'আচ্ছা সাহেব, আপনি জানেন, শিকারী যখন একদৃষ্টে শিকারের প্রতি লক্ষ্য করেন তখন তাঁদের একটি চোখ সাধারণত বন্ধ রাখতে হয়। এই পরিবেশে যদি আপনার ছবি আঁকা যায় তাহলে আপনার এই আঙ্গিক ত্রুটি সাধারণের চক্ষে ধরা পড়ে না, অথচ আসল উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়, এতে আপনার আপত্তি কি?' এ প্রস্তাব সাহেবের বেশ মনোমত হয়, তিনি আনন্দের সহিত সম্মতি দেন। পৌরাণিক ভারতের যেসকল চিত্র শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রং তুলিতে আঁকিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। আমাদের অতীত ভারতের চিত্র সংস্কৃতি বামাপদবাবুর শিল্পায়নে আজও বাঙ্ময়।

চিত্রে রাণী এলিজাবেথ

ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবং
ডিউক অফ্ এডিনবার্গ।

বালমোরাল ক্যাসেলে
পুত্র-কন্যাসহ রাণী
এলিজাবেথ ও
ডিউক

লণ্ডনের সুবিখ্যাত
বাকিংহাম
প্যালেসের ড্রইংরুম
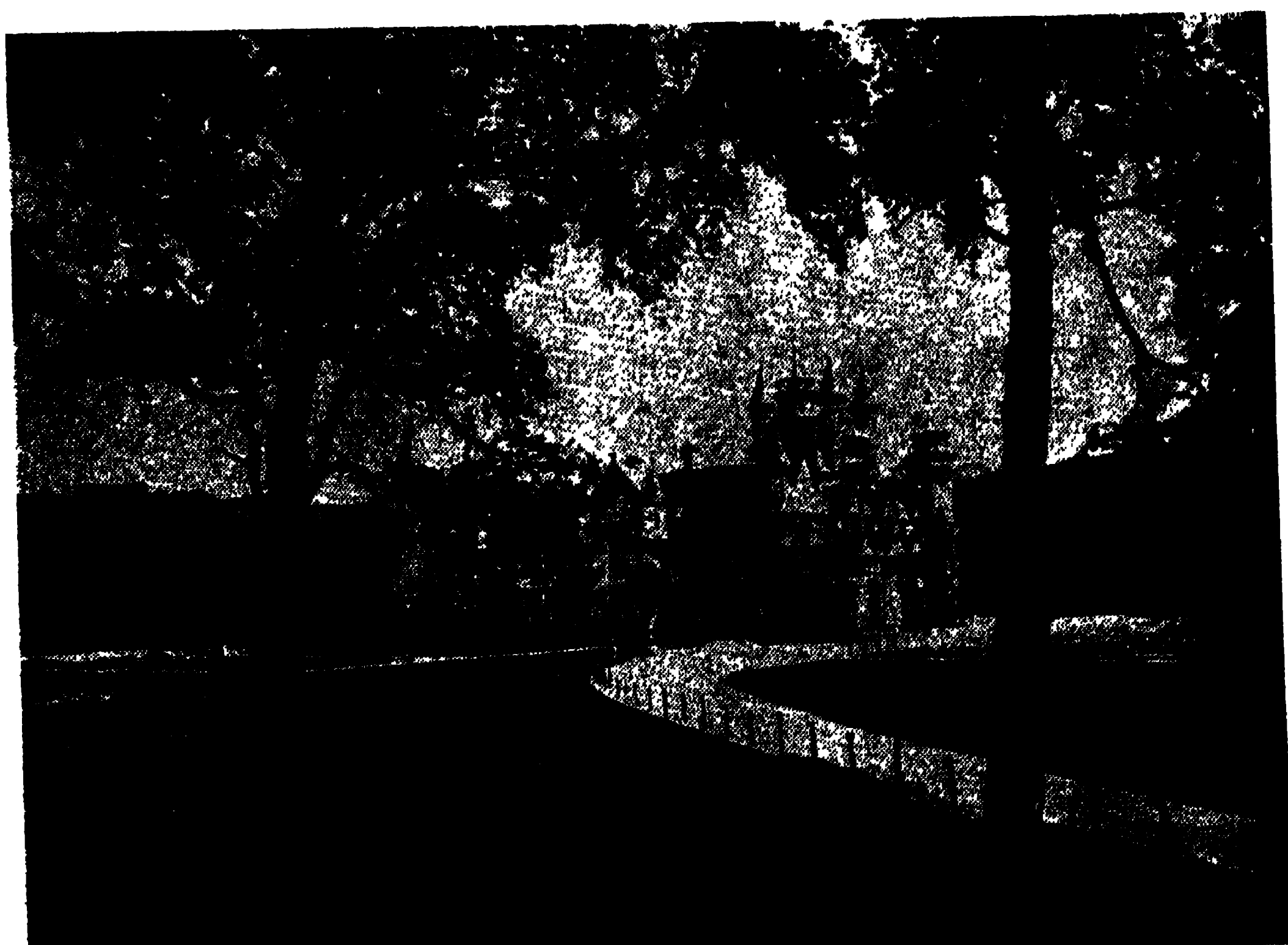
স্কটল্যাণ্ডে রাজ-
পরিবারের
অন্যতম বাসগৃহ
বালমোরাল
ক্যাসল্‌।

রাণী এলিজাবেথের পাঁচটি বাস ভবন

ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর পাঁচটি বাসভবন হল— বাকিংহাম প্রাসাদ, উইণ্ডসর ক্যাসল্, হলিরুডহাউস প্রাসাদ, বালমোরাল ও স্যাণ্ড্রিংহাম।

লণ্ডনের বাকিংহাম প্রাসাদ, উইণ্ডসর ক্যাস্‌ল, ও এডিনবরার হলিরুডহাউস, যেখানে স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী একসময় বাস করতেন, এই তিনটি ভবন হল রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও ডিউক অব এডিনবরার সরকারী বাসভবন। অন্য দুটি ভবন—স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত এবার্ডিনশায়ারে অবস্থিত বালমোরাল কাস্‌ল এবং স্যাণ্ড্রিংহাম—হল রাণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখানে রাণী ও ডিউক প্রতি বৎসর পুত্র-কন্যাদের নিয়ে অবসর যাপন করে থাকেন।

সফরে বের হতে না হলে রাণী সাধারণতঃ বড়দিনের সময় স্যাণ্ড্রিংহামে স্বামী এবং পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে এসে থাকেন। এস্‌কট্‌ সপ্তাহে রাণী থাকেন উইণ্ডসরে এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে বালমোরালে।

রাণী ও ডিউক অব এডিনবরা প্রিন্স অব ওয়েলস, রাজকুমারী অ্যান ও অ্যাণ্ড্রুকে নিয়ে বড়দিন আরম্ভ হবার তিন কি চার দিন পূর্বে স্যাণ্ড্রিংহামে এসে পৌঁছান এবং সেখানে জানুয়ারী মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাস করেন; রাণী লণ্ডনে ফিরে এসে ইস্টার পর্য্যন্ত বাকিংহাম প্রাসাদে অবস্থান করেন। ইস্টার তিনি অতিবাহিত করেন উইণ্ডসর কাস্‌লে। উইণ্ডসর গত ৮৫০ বছর ধরে ইংলণ্ডের রাজা এবং রাণীদের বাসভবন হয়ে আছে, এটি প্রাচীন কালের দুর্গ বলতে যা বোঝায় সেই ধরণের একটি দুর্গ। এর ধূসর প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর, সমুন্নত টাওয়ার এবং বিরাটকায় তোরণগুলি স্বভাবতই মানুষের মনকে নাড়া দেয়।

সেণ্ট জর্জেস চ্যাপেলটি স্থাপত্যের গথিক রীতির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত, এটি রাজাদের সমাধি মন্দির, ষষ্ঠ হেনরী, প্রথম চার্লস, তৃতীয় জর্জ, চতুর্থ উইলিয়াম, সপ্তম এডওয়ার্ড, পঞ্চম জর্জ এবং ষষ্ঠ জর্জের সমাধি এখানে আছে।

রাণী ও ডিউক ইস্টারের সময় প্রায় এক মাস উইণ্ডসরে অতিবাহিত করেন। জুন মাসে এস্‌কট্‌ সপ্তাহে তাঁরা সেখানে আবার ফিরে আসেন; এই সপ্তাহটি হল ঘোড়দৌড়ের সপ্তাহ, বহু অতিথি এই সময় কাস্‌লে এসে সাময়িক ভাবে বাস করেন।

ইস্টারের শেষে উইণ্ডসর থেকে ফিরে রাণী ও ডিউক যে পর্য্যন্ত লণ্ডনে অবস্থান করেন, মে মাসে তাঁরা হুইট্‌সান উপলক্ষে চিরাচরিত প্রথায় বালমোরালে চলে যান। সেখানে তাঁরা প্রায় দশদিন থাকেন কিন্তু আগষ্টের প্রথম সপ্তাহের শেষে রাণী ও ডিউক গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগের জন্য বালমোরালে চলে আসেন। বালমোরাল প্রাসাদটি শ্বেত-প্রস্তরের; এটি ডী নদীর তীরে একটি মনোরম পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। সেপ্টেম্বর মাসের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি এখানে থাকেন।

রাণী স্কটল্যাণ্ডে হলিরুডহাউস থেকে তাঁর সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন।

বাকিংহাম প্রাসাদটি ম্যালের ঠিক সামনেই অবস্থিত; এখান থেকে দেখা যায় এডমিরল্‌টি আর্চ ও ট্রাফালগার স্কোয়ার। ব্রিটেন সফরকারীদের কাছে এই প্রাসাদটির আকর্ষণ খুব বেশি, প্রতিদিন শত শত সৌখিন ফটোগ্রাফার এখানে ভিড় করছেন প্রাসাদটির চিত্র গ্রহণের জন্য। ১৮১৯ সালে ন্যাশ চতুর্থ জর্জের জন্য এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন, তারপর ১৮ বৎসর বয়সে রাণী ভিক্টোরিয়া প্রথম তা নিজের বাসের জন্য গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত তা রাজা ও রাণীর প্রধান বাসভবন হয়ে আছে। বাকিংহাম প্রাসাদে রাণী বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এটি ব্রিটেনের সর্ববৃহৎ বাসভবন। এর কামরা সংখ্যা প্রায় ৬০০।
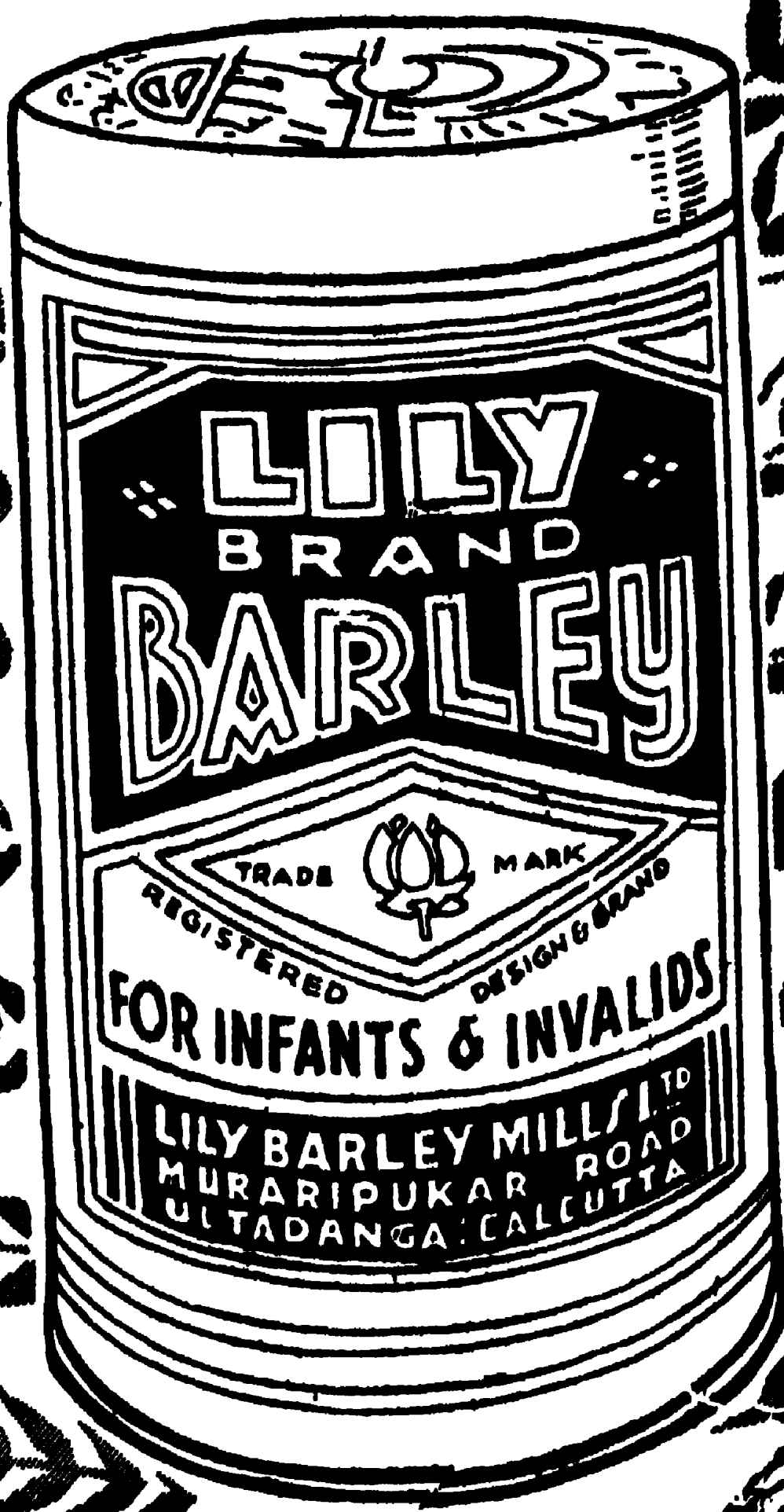
উৎকৃষ্ট
বার্লি
বলিতেই
লিলি
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
REGISTERED DESIGN & BRAND
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LTD
MURARIPUKAR ROAD
ULTADANGA, CALCUTTA
সম্পূর্ন বিশুদ্ধ, টাট্কা
ও স্বাস্থ্যপ্রদ
সকল বয়সে ও ঋতুতে সমান উপযোগী
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪